ভিসা ও নিরাপত্তা

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আইমান

অনুবাদঃ মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ দাঃ বাঃ

আল-ফজর

ভিসা ও নিরাপত্তা

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আইমান হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

মুফতি আনাস আবদুল্লাহ দাঃ বাঃ

শাইখের কিতাব "আত-তাবরিয়া"(التبرئة) থেকে সংকলিত

ভিসা ও আমান

“ওয়াসিকাতুত তারশীদ” এর লেখক বলেছেন - ভিসা হল কোন রাষ্ট্রে প্রবেশেচ্ছুক মুসলিমের জন্য উক্ত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমান বা নিরাপত্তানামা। একারণে উক্ত মুসলিমের উপর আবশ্যক হল, ঐ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে যে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, তার বদলায় উক্ত রাষ্ট্রকেও তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া। সে যদি উক্ত রাষ্ট্রের সম্পদ বা তার অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করে, তবে সে গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক ও শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

আমি এই পরিচ্ছেদে এই মাসআলাটি কিছুটা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করব এবং নিম্নোক্ত শিরোনামগুলোর অধীনে বিষয়টির পর্যালোচনা করব:

১- ভূমিকা।

২- ভিসা কি আমান?

৩- আমরা যদি মেনে নেই যে, ভিসা আমান, তাহলে প্রশ্ন হল, কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমকে নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে কি মুসলিমের পক্ষ থেকেও কাফেরের নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয়ে যায়?

৪- আমরা যদি মেনে নেই যে, কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমকে আমান দেওয়ার কারণে মুসলিমের পক্ষ থেকেও কাফেরের নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয়ে

যায়, তাহলে প্রশ্ন হল, এই নিরাপত্তা কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সীমালঙ্ঘন করা অবস্থায়ও বহাল থাকবে?

৫- ভিসা আমান হওয়ার ব্যাপারে লেখকের দলিলগুলোর পর্যালোচনা।

৬- সারসংক্ষেপ।

৭- শেষ কথা।

ভূমিকা

ভিসার মাসআলাটি একটি আধুনিক মাসআলা। যার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা পূর্ববর্তী ফুকাহাদের কোন বক্তব্য নেই। শুধু তাই নয়, কতিপয় সমসাময়িক ফকীহ ভিসাকে আমেরিকায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য বাঁধা হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যেমন শায়খ নাসির আল-ফাহদ (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন)

তাদের অনেকে আমেরিকায় ৯/১১ আক্রমণের জন্য খুশি হয়েছেন, সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং এ আক্রমণ যে পন্থায় করা হয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও যারা এ আক্রমণ পরিচালনা করেছেন তাদের প্রশংসা করেছেন। যেমন শায়খ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি, শায়খ হুসাইন ওমর ইবনে মাহফুজ, শায়খ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসী, শায়খ আবু কাতাদা ও শায়খ আব্দুল্লাহ আর-রাশুদ।

এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ ও গবেষণাগত মাসআলা। **যিনি এতে তৃপ্তিবোধ করবেন না, তিনি তা গ্রহণ করবেন না। আর যিনি তৃপ্তিবোধ করবেন, তার জন্য তা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।**

ফিকহুল জিহাদে ফুকাহায়ে কেরামের এমন অনেক ইখতিলাফের উদাহরণ রয়েছে, যার ফলাফল ব্যাপক। যেমন মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ব্যাপারে ইখতিলাফ, মুরতাদ নারীকে হত্যার ব্যাপারে ইখতিলাফ এবং এছাড়াও আরো বিভিন্ন মাসআলায় ইখতিলাফ।

ভিসা কি নিরাপত্তা আমান?

ভিসার সংজ্ঞা কি?

(১) 'মাওসুআতুল ব্রিতানিয়া ২০০৩' (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া) এ পাসপোর্ট সংক্রান্ত আলোচনায় ভিসার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার অনুবাদ-

"অধিকাংশ দেশই তার সীমানায় প্রবেশেচ্ছুক প্রবাসীদের উপর ভিসা সংগ্রহ করা আবশ্যক করে। ভিসা হল, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ থেকে পাসপোর্টের ব্যাপারে একটি সত্যায়নপত্র, যা একথা বুঝাবে যে পাসপোর্টটি যাচাই করা হয়েছে এবং এর বাহক যাওয়ার উপযুক্ত। ভিসা প্রবাসীকে কোন দেশে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান করার অনুমোদন দেয়।"

(২) "মাওসুআতু ইনকারতা ২০০৬" (এনসাইক্লোপিডিয়া এনকার্টা) ভিসার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তার অনুবাদ:

"ভিসা: রাষ্ট্রীয় এমন সত্যায়ন যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাসপোর্টের মধ্যে দেওয়া হয়। এটা বুঝায় যে, সে যে দেশে ভ্রমণ করার নিয়ত করেছে উক্ত দেশের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাসপোর্টটি যাচাই করা হয়েছে এবং তাকে উপযুক্ত পাওয়া গেছে, তাই এর বাহক আইনগতভাবে তার গন্তব্যে যেতে অনুমোদিত।"

(৩) উক্ত মাওসুআর সাথে সংযুক্ত অভিধানে ভিসা শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে তার অনুবাদ-

(ক) বিশেষ্য: এটা তার বাহককে কোন দেশে প্রবেশ করার বা উক্ত দেশ ত্যাগ করার বা উক্ত দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করার অনুমোদন দেয়। ভিসা হল, পাসপোর্টের মধ্যে পাসপোর্টের ব্যাপারে বা কোন অঞ্চলে ভ্রমণের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সম্মতি।

অথবা অন্য কথায় ভিসা হল রাষ্ট্রীয় অনুমোদনপত্র।

(খ) কারক: ১- ভিসার সাথে একটি প্রমাণপত্র দেওয়া। ভিসাটি পাসপোর্টের ভেতর বা অন্য কোন প্রমাণপত্রে যুক্ত করা।

২- কাউকে ভিসা দেয়া,

ভিসার সংজ্ঞা ও অর্থ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এর মধ্যে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিতও নেই।

(৪) যদি বলা হয় যে, এখানে যদিও লিখিত শাব্দিক চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তাচুক্তি হয় না, কিন্তু মানুষের মাঝে প্রচলিত অঘোষিত একটি চুক্তির মাধ্যমে এই নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয়- তাহলে একথার উপর একটি বড় ধরণের প্রশ্ন আসবে যে, **এই চুক্তির পক্ষগুলো কারা?**

এখানে কি মুজাহিদদের পক্ষ থেকে একদিকে আমেরিকার সাথে এবং অপরদিকে আমেরিকা ও তার মিত্রদের সাথে এমন চুক্তি হয়েছে, যে চুক্তি শাব্দিকভাবে বা প্রচলনগতভাবে এই নিরাপত্তা প্রদান করে? নাকি এর বিপরীতটিই বাস্তবতা? যা সামনে বিস্তারিতভাবে পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হবে।

(খ) যদি বলা হয় যে, এই চুক্তি ভিসার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য, কনস্যুলার কার্যক্রম ও এ সংশ্লিষ্ট প্রচলনের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তাহলে এর উত্তর স্পষ্ট: **এ ধরণের মতৈক্য মেনে চলা আমাদের উপর আবশ্যক না।** শায়খ হামুদ বিন আল-উকলা আশ-শুয়াইবি রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খ নাসির

আলফাহ্‌দ (আল্লাহ্‌ তাকে কারামুক্ত করুন) এর বক্তব্য এ বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

এখন যদি বলা হয়, আমরা আপনাদের জন্য মেনে নিলাম যে মুজাহিদগণ শাব্দিক-প্রচলনগত কোনভাবেই আমেরিকান নিরাপত্তাচুক্তির মধ্যে নেই। কিন্তু মুজাহিদগণ তো, বিশেষ করে ১১ সেপ্টেমম্বরের মুজাহিদগণ তো ইমারাতে ইসলামিয়ার পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেনি। বরং মিশর, সৌদি, লেবানন ও আরব আমিরাতের পাসপোর্ট নিয়ে প্রবেশ করেছে। আর এ সকল রাষ্ট্রগুলো তো আমেরিকার সাথে আমানের মধ্যে মধ্যে আছে?

এই বক্তব্যও ভুল হবে। কারণ এসকল রাষ্ট্রের মুসলিমগণ এবং এছাড়াও সকল মুসলিমগণই আমেরিকার কারণে অসংখ্য বিপদ ও দুর্যোগের মধ্যে আছে। চাই নিজ দেশের অভ্যন্তরে হোক বা বাইরে হোক।

শুধু আমেরিকায় নয়, নিজ দেশেই কোন মুসলিম কি পারবে মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় পলিসির বিরোধিতা করতে? শায়খ আবু আলী আলহারেসীর হত্যার ঘটনা এর সুস্পষ্ট দলিল।

"ওয়াসিকাতুত তারশীদ" এর লেখকও আমেরিকান রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তিনি ইয়ামানী প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ সাত বছর সত্যিকারার্থে এক বিস্ময়কর জীবন যাপন করেছেন। এরপর যখন আমেরিকা চাইল তাকে কারারুদ্ধ করতে, তখন কারারুদ্ধ করে ফেলল। কিন্তু তিনি বাস্তবতাকে উল্টিয়ে দিলেন। তিনি মনে করেন তার বিপদাপদের কারণ হল মুজাহিদগণ, আর এমন বলাই সহজ কারণ এরাই অপেক্ষাকৃত দুর্বলপক্ষ। এছাড়া যেহেতু তিনি বড় বড় লিডারদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত এবং এর মাধ্যমেই উত্তরণের পথ খুজেন।

প্রকৃতপক্ষে যারা এই প্রমাণপত্র প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেন, তারা কোন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অমুক পাশা বা তমুক বেগ নয়। বরং তারা হল,

আমেরিকান অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা বিভাগের সন্ত্রাস দমনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যবাদী ও এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিমগণ আমেরিকায়, পশ্চিমা দেশগুলোতে বা তাদের নিজ দেশে, এমনকি সারা বিশ্বের কোথাও আমেরিকার কাছ থেকে নিরাপদ না। সর্বত্র মুসলিমরা আমেরিকান ভয়, ত্রাস ও নির্যাতনের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। আমেরিকাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তারা মুসলিমদের সাথে যে সমস্ত চুক্তি করেছে, যেমন বন্দীদের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলা, সেগুলোও ভঙ্গ করেছে। মুসলিমদেরকে অত্যাচার করেছে, তাদের জন্য গুয়ান্তানামো কারাগার তৈরী করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর হামলার ব্যাপারে কংগ্রেসের বক্তব্য থেকেই এর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তবে নমনীয় সুরে।

তাহলে আমেরিকান পলিসি থেকে নিরাপত্তা -আমান কোথায় আছে?

আমেরিকা দাবি করে, তারা বন্দি-অধিকার ও মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করে এবং মানবাধিকার বিরোধী যেকোন নির্যাতন, অমানবিক কারারুদ্ধকরণ ও যেকোন ধরণের সীমালঙ্ঘনের বিরোধিতা করে। অথচ আমেরিকাই বন্দি মুসলিমদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানোর কথা স্বীকার করেছে। তারা বিশ্বের সর্বাস্থানের মুসলিমদেরকে কোন ধরণের বিচারিক নির্দেশনা বা অভিযোগপত্র ব্যতিত শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশিমত গ্রেফতার করে চলেছে। অত:পর নিজেদের ইচ্ছেমত দীর্ঘসময় ধরে গোপন কারাগারে রেখে দিচ্ছে, যেগুলোর ব্যাপারে তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। সেখানে তারা জঘন্য নির্যাতন ও তথ্য উদ্ধারের সব ধরণের নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করছে। তাহলে আমেরিকা - যারা মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করে চলেছে। তাদের নিজেদের স্বীকৃত নীতিগুলোও মানছে না, আর আন্তর্জাতিক আইনগুলোরও কোন তোয়াক্কা করছে না – তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা বা আমান কিভাবে লাভ হল?

ইরাকের ব্যাপারে আমেরিকা দাবি করেছে, সাদ্দামের নিকট ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র রয়েছে, তাই জাতিসঙ্ঘকে ইরাক আক্রমণের আবেদন করেছে। কিন্তু যখন তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল না, তখন নিজেরাই ইরাকে আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দিল। কিন্তু কোন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পেল না। অথচ আমেরিকা অন্যান্য দেশগুলোকে জাতিসঙ্ঘের আইন-কানুন না মানার জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে।

অপরদিকে আমেরিকা বিরাট পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণুমিশ্রিত অস্ত্রের অধিকারী। কিন্তু তারা অন্যদের উপর এটা হারাম করে রেখেছে, যেন বিশ্ব তাদের হুমকির মধ্যে থাকে। তাই সমস্ত মুসলিমগণ, এমনকি সমস্ত মানবজাতি আমেরিকার ভয়, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে আছে।

তাহলে কোথায় সেই প্রথাগত আমান, যেটার কথা এই লেখক বলছে। তারপর আবার তার পক্ষে অনেক ফিকহী সূত্রের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। যেমন:

“প্রথাগতভাবে প্রচলিত নীতি শর্তের মাধ্যমে শর্তকৃত নীতির ন্যায়।”

“প্রচলন ফায়সালাকারী”।

বরং প্রথা ও প্রচলন তো হল, সারা বিশ্বের মানুষ আমেরিকান সন্ত্রাস, আমেরিকান গাদ্দারি ও আমেরিকান প্রতারণার রাজনীতির ভয়ে আছে। এটাই বাস্তবতা। এর থেকে উদাসীন ব্যক্তির জন্য ফাতওয়া দেওয়ার বা মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপার কথা বলার অধিকার নেই। **কারণ বাস্তবতার খবর রাখা ও তা উপলব্ধি করা ফাতওয়া দেওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত। কারণ ফাতওয়া হল উপস্থিত পরিস্থিতির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম প্রদান করা।**

আমেরিকা নিজেকে এই অধিকার দিয়ে রেখেছে যে সে যেকোন মুসলিমকে তার ভিসা, আকামা বা পাসপোর্টের প্রতি লক্ষ্য করা ব্যতিত গ্রেফতার করতে পারে। এর অসংখ্য উদাহরণ থেকে কয়েকটি নিচে দেওয়া হল:

(১) আবু তালাল আল-আনসারীর অপহরণের ঘটনা। ক্রোয়েশিয়ার গোয়েন্দাবাহিনী তার ব্যাপারে অবগত হয়। অথচ তার সাথে ছিল ডেনমার্কের পাসপোর্ট এবং ক্রোয়েশিয়ার ভিসা। কিন্তু আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা তাকে অপহরণ করে মিশরের হাতে সপে দেয়। ফলে এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না, তার শেষ পরিণতি কী হয়েছে!

(২) জামাতুল জিহাদের ঐ সকল ভাইদের ঘটনা, যারা আলবেনিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে বের হয়েছিলেন। তারা আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের হাতে অপহৃত হন। ঐ সকল ভাইদেরকে আলবেনিয়া থেকে মিশরে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে তারা নির্যাতন ও বন্দিত্বের শিকার হন। যাদের মধ্য থেকে দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তারা হলেন আহমাদ আন-নাজ্জার ও আহমাদ ইসমাঈল রহিমাহুমুল্লাহ। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলবেনিয়ান পুলিশদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন। ঐ সকল ভাইদের আলবেনিয়ান সরকারের নির্দেশে আলবেনিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। কারণ আলবেনিয়ান সরকার তাদের অবস্থানের দ্বারা উপকৃত হচ্ছিল। তারা সেখানে রিলিফ সংস্থায় কাজ করতেন। আমেরিকার চাপের কারণেই এই ভাইদের আলবেনিয়া থেকে বের করে দেয়া হয়।

শুধু তাই না, তাদের কাউকে কাউকে আলবেনিয়ান বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হলে বিচারক তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করেন। কারণ তাদের রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র ছিল, অবস্থান করার জন্য দরকারী সব কাগজ ছিল এবং তারা এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হননি, যাতে তারা শাস্তির উপযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু বিচারক মুক্তি দেওয়ার পরও আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা ও আলবেনিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে তাকে গ্রেফতার করে।

ওয়াসিকার লেখক এ ঘটনা ভালভাবেই জানেন। স্বয়ং ঐ সকল ভাইদের মামালাতেই তার ব্যাপারে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। একই দণ্ডাদেশের অধীনে মিশরের বিভিন্ন কারাগারে তিনি বন্দী থেকেছেন। কিন্তু তিনি এখন বাস্তবতাকে উল্টে দিয়ে এবং এর ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়ে কারামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন।

(৩) শায়খ আবু হাজর আলইরাকী (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!)এর অপহরণের ঘটনা। জার্মানির রাষ্ট্রীয় ভিসা নিয়ে সেখানে পৌঁছার কয়েকদিনের মাথায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি জার্মানির কোন আইনের বিরোধিতায় লিপ্ত হননি। বরং জার্মান বিচারক সরাসরি তাকে বলেছে: আপনার সমস্যা আমেরিকার সাথে, জার্মানির সাথে আপনার কোন সমস্যা নেই!!

শায়খ আবু হাজর ও আলবেনিয়ার ভাইদের ঘটনা দু'টি ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বরের **আগে**। যে ১১ সেপ্টেম্বরের ব্যাপারে ওয়াসিকার লেখক মনে করে যে, এটাই মুসলমানদের উপর সকল বিপদাপদ আসার কারণ।

(৪) ইতালি থেকে শায়খ আবু ওমরের অপহরণ, অত:পর শাস্তি দেওয়ার জন্য মিশরে নির্বাসন। অথচ তিনি রাষ্ট্রীয় আকামা ও বৈধ ভিসা বহন করছিলেন।

এসকল ঘটনায় এবং এমন আরো অসংখ্য ঘটনায় ভুক্তভোগীগণ সকলেই বৈধ পাসপোর্ট, রাষ্ট্রীয় ভিসা ও রাষ্ট্রীয় নিখুত বসবাসের অনুমোদন বহন করছিলেন। কিন্তু এগুলো তাদেরকে নির্বাসন দেওয়া, কারারুদ্ধ করা, নির্যাতন করা ও হত্যা করা থেকে রক্ষা করেনি। তাহলে সেই ভিসার আমান কোথায় গেল, যার কল্পনাও আমাদের কিছু লোক ব্যতিত কারো অন্তরে নেই?

অতএব, **যদি আমেরিকা ও পশ্চিমারা ভিসা বা পাসপোর্টের কোনও পরওয়া না করে, তাহলে আমরা কেন এটার পরওয়া করবো?**

এমনকি যদি এই ভিসা নিরাপত্তা চুক্তিও হয়, আর তারা তা লঙ্ঘন করে, তাহলে কি আমাদের জন্য কোন ঘোষনা না দিয়ে তাদের সাথে তাদের অনুরূপ মুআমালা করার অধিকার নেই? যেমনটা আমি আল্লাহর তাওফিকে সামনেই ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর সূত্রে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

ভিসা কি কাফেরদের দেশে একজন মুসলিমকে নিজের জান, মাল, পরিবার ও দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপত্তা দেয়?

(১) ভিসা কোন মুসলমানকে নিজের জানের ব্যাপারে নিরাপত্তা দেয় না।

(ক) এজন্যই এমন দেশে নির্বাসন দেওয়া হয়, যেখানে তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, হত্যা করা হবে, কারারুদ্ধ করা হবে। পশ্চিমে অনেক দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণকারীকে মিশর ও অন্যান্য দেশে নির্বাসিত করা হয়এছে। সেখানে তাদেরকে নির্যাতনের সম্মুখীন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে এখনো পর্যন্ত বন্দী আছেন।

এই লেখক এবং যারা তার মতের সাথে একমত পোষণ করেছিল তাদের মধ্য থেকেই কাউকে কাউকে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রই মিশরের হাতে সপে দিয়েছিল নির্যাতন করার জন্য। শুধু তাই নয়, যে পশ্চিমা রাষ্ট্রটি রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষা করা এবং মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করার দাবি করে সেই রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণকারী জনৈক ভাইয়ের সাথে উক্ত দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এমন আচরণ করেছিল শুধুমাত্র একারণে যে, আমি আমার একটি ভাষণে তার দু'/একটি কথার মাধ্যমে দলিল পেশ করেছিলাম। তাই তারা তাকে এমন বিষয়ের ব্যাপার জেরা করে, যা সে করেনি এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে পূর্বে তারাই যে মত প্রকাশ করতে অনুমোদন দিয়েছিল, তার জন্যও তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে। আমি যখন উক্ত ভাইয়ের একটি কথাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করলাম, তখন তাদের সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধোঁয়ায় উড়ে গেল। এই ওয়াসিকার লেখক যে

নিরাপত্তাচুক্তির ধারণা করেন, তারা তাকে সামান্যও গণ্য করল না। বরং উক্ত ভাইকে নির্বাসিত করা ও শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিল।

তাই যদি ভিসা তার বাহককে নিরাপত্তাই দিত, তবে অবশ্যই তাকে তার নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক ছিল। উক্ত দেশের জন্য তাকে বন্দী করা, শাস্তি দেওয়া বা হত্যা করার বৈধতা ছিল না।

অপরদিকে যাদেরকে নির্যাতন করার জন্য, বন্দী করার জন্য এবং হত্যা করার জন্য ঐ সকল রাষ্ট্রগুলো থেকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছিল, তাদের শুধু ওই সকল আদালতগুলোতে অভিযোগ করা ব্যতিত কোন কিছু করার অধিকার ছিল না। এই আদালতগুলো নিজেদেরকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একক অধিকারী মনে করে আর এটা বিবেচনাও করে না যে, ভিসা তার বাহককে এর থেকে রক্ষা করতে পারে বা তাকে নির্বাসিত করা থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে, যে রাষ্ট্র তাকে ভিসা দিয়েছে, সেই রাষ্ট্রই তাকে নির্বাসন দেওয়া বা বহাল রাখার অধিকার সংরক্ষণ করছে। আর যার ব্যাপারে নির্বাসনের ফরমান জারি করা হয়, তার শুধু এই মর্মে আদালতের দ্বারস্ত হওয়া ব্যতিত কোন অধিকার নেই যে, তাকে শাস্তি বা হত্যার সম্মুখীন করা হচ্ছে। কিন্তু সে কখনো নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এরকম সমালোচনা করার দু:সাহসিকতা দেখাতে পারবে না যে, এটা ভিসা তাকে যে নিরাপত্তা দিয়েছে, তার সাথে সাংঘর্ষিক। পশ্চিমা আদালতে এটার তারা কল্পনাও করতে পারে না।

(খ) পাশ্চাত্যে বসবাসকারী অনেক মুসলিমকে বন্দী করা হয়েছে এবং এখনো তারা কারাগারে আছে। কাউকে কাউকে তারা নিজ দেশে নির্বাসিত করার হুমকি দিচ্ছে, যেখানে তাকে শাস্তি দেওয়া বা হত্যা করা হতে পারে। অনেককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নজরবন্দী বা গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। ফলে যদি তার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে, তবে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হবে। এ সব কিছু করা হচ্ছে কোন ধরণের অভিযোগ উত্থাপন ব্যতিত। পশ্চিমারা এটা মনে করছে না যে, দেশের প্রবেশের ভিসা বা রাজনৈতিক

আশ্রয় তাদের এধরণের অপরাধকর্মগুলোর জন্য বাঁধা হবে। বরং তারা মনে করছে যারা তাদের মাঝে বসবাস করে বা তাদের দেশে প্রবেশ করে, তাদের সকলের উপর আদেশ-নিষেধ জারি করার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। আমান রক্ষা করা বা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তার ব্যাপারে কোনও কল্পনা করা ছাড়াই তারা এমন যেকোন আইন পাস করতে পারে, যা তার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারে। **প্রকৃতপক্ষে ভিসাকে আমান মনে করার কথাটি আমাদের একটি কল্পনাবিলাস মাত্র, পশ্চিমারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা জানলে হয়ত এটা নিয়ে বিদ্রূপ করত!**

(গ) এমনিভাবে অনেক সময় কোন প্রবাসী মুসলিম পশ্চিমা কোন দেশে কোন মামলায় ওয়ান্টেড হয়, কিন্তু সে তা জানে না। অত:পর যখন সে দূতাবাসে গিয়ে ভিসা চায়, অনেক সময় বিষয়টি তাকে না জানিয়ে ভিসা দিয়ে দেয়। অত:পর যখন সে তাদের বিমানবন্দরে যায়, তখন গ্রেপ্তার করে ফেলে। যদি ভিসা নিরাপত্তা চুক্তি হত, তাহলে তারা এটা করতে পারত না। শায়খ মুহাম্মদ আলইয়ামানী (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!) এর ঘটনা প্রসিদ্ধ, সবার জানা। প্রথমে তার হাতে হামাসের অনুদানের অর্থ সোপর্দ করার কথা বলে তাকে জার্মানি যেতে দেওয়া হয়, অত:পর সেখানে যাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখনো পর্যন্ত তিনি কারাবন্দী আছেন। আমরা মুহাম্মাদ আন-নাফি আস-সুদানীর ঘটনা জানি, যাকে তার বিশ্বাসগাতক গুপ্তচর শশুর জামাল আল-ফজল জার্মানি যেতে দেয়। অত:পর তাকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনীর চর হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। তিনি যখন তা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তাকে আমেরিকায় নির্বাসিত করা হয়। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি কারাগারে আছেন। এধরণের ঘটনাবলীর কোন অন্ত নেই।

ভিসা কি মুসলিমের পরিবারের ব্যাপারে নিরাপত্তা দেয়?

পশ্চিমা দেশগুলোর ভিসা অর্জনকারী ব্যক্তিও অনেক সময় নিজ পরিবারের উপর জুলুমের শিকার হন। তার কয়েকটি উদাহরণ নিন:

(ক) মুসলিমের সন্তানকে পশ্চিমা শিক্ষা শিখতে বাধ্য করা হয়। পিতা যদি বাচ্চাকে পশ্চিমা বিদ্যালয়ে পাঠাতে অমত করে, তাহলে তার কাছ থেকে সন্তানকে জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়। তারপর কখনো অমুসলিম পিতা-মাতার কাছে দত্তক দেওয়া হয়।

(খ) একজন মুসলিম তার ছেলে-মেয়েকে নামায, রোজা, হজ্জ, এমনকি পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধানগুলো পালন করতেও বাধ্য করতে পারে না। যদি এর কিছু বাধ্য করার চেষ্টা করে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস বাস্তবায়নের চেষ্টা করে –

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ..

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ করো তাদের সাত বছর বয়সে এবং তাদেরকে এর জন্য প্রহার করো দশ বছর বয়সে।"[১]

তখন প্রত্যাখ্যানকারী সন্তান বা প্রত্যাখ্যানকারী মা-বিশেষ করে যদি অমুসলিমা হয়- বা প্রতিবেশি বা বাচ্চার শিক্ষকের অধিকার আছে তার বিরুদ্ধে মামলা করার। এর ফলে কখনো তার থেকে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোন পরিবারে দিয়ে দেওয়া হয়, যারা কখনো অমুসলিমও হয়।

---

১ মুসনাদে আহমাদ- হাদিস নং- ৬৪৬৭, খণ্ড-১৪ পৃষ্ঠা-৫

(গ) ফ্রান্সের বিদ্যালয়গুলোতে একজন মুসলিমের কণ্যা পরিপূর্ণ হিজাব তো দূরের কথা, শুধুমাত্র মাথার হিজাবটুকু পরতে পারে না। কোন কোন দেশে নিকাব পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২]

(ঘ) কোন মুসলিমের কন্যা যদি নাইটক্লাবে তার বন্ধুদের সাথে আনন্দ-ফূর্তি করতে বের হয়ে যেতে চায়, তবে সে তাকে নিষেধ করতে পারবে না। যদি এমন চেষ্টা করে, তাহলে মেয়ের অধিকার আছে বাপকে ধরার জন্য পুলিশ ডেকে আনার।

(ঙ) যদি তার কন্যা তার প্রেমিকাকে বাড়িতে ডেকে আনে, তাহলে বাবার বাঁধা দেওয়া অধিকার নেই। যদি বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে মেয়ের পুলিশের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে, যাতে সে নিজ ইচ্ছামত যা চায় তা করতে পারে।

(চ) যদি পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী কোন মুসলিম নিজ সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোন মুসলিম দেশে হিজরত করতে চায়, আর তার এই দেশী স্ত্রী তাতে বাঁধ সাধে, তাহলে উক্ত স্ত্রী তাকে রাষ্ট্রীয় শাস্তির ভয় দেখিয়ে শক্তিবলে বাঁধা দিতে পারে। শাস্তি হল, যেমন নির্বাসন দেওয়া বা সন্তানের বাসগৃহের নিকটবর্তী হওয়া থেকেও বঞ্চিত হওয়া। এ বিষয়ক ঘটনা বারবারই ঘটছে এবং অনেক প্রসিদ্ধ।

(ছ) কোন মুসলিম নিজ ছেলে মেয়েকে অশ্লীলতায় জড়িত হওয়া, মদ পান করা, জুয়া খেলা বা নগ্ন ভিডিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া বা অশ্লীল গানের আড্ডাখানায় উপস্থিত হওয়া থেকে বাঁধা দিতে পারবে না।

(জ) একজন মুসলিমের মেয়ে পাপিষ্ঠ বা কাফের যার সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক পিতামাতা তাতে আপত্তি করতে পারবে না।

---

২ বর্তমানে শুধু ফ্রান্সই না ইউরোপের অনেক দেশেই এমন আইন পাশ হয়েছে। অনুবাদক।

(ঝ) কোন মুসলিম দ্বিতীয় বিবাহ্ করলে তার বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি হয়ে যায়। কখনো তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিবাহ্ বাতিল করে দেয়া হয়। এতে তার দ্বিতীয় বিবাহ্ করার শরয়ী অধিকার খর্ব করে তার সম্মানের উপর হামলা করা হচ্ছে। একারণে মুসলিমগণ সেখানে দ্বিতীয় বিবাহ্ করেন গোপনে। দ্বিতীয় বিবাহ্ ঘোষণা করার বা নিবন্ধিত করার মত দু:সাহকিতা দেখাতে পারেন না কেউ।

(ঞ) কোন মুসলিমের স্ত্রী যদি তার অবাধ্যতা করে, তার বিছানায় আসতে অস্বীকার করে এবং নিজ পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্বামীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তাহলে উক্ত মুসলিম তার স্ত্রীর উপর কুরআনের হুকুম জারি করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতাআলা বলছেন:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর,(প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অত:পর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ্ সকলের উপর, সকলের বড়।” (নিসা:৩৪)

যদি তার অসন্তুষ্টিতে তার হক গ্রহণ করার চেষ্টা করে, তবে তার স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের সম্মুখীন করার। কারণ সে তাকে “ধর্ষণ” করেছে। আর যখন প্রহার করার মাধ্যমে তার উপর কুরআনের হুকুম প্রয়োগ করতে চাইবে, তখন তার জন্য অপেক্ষা করবে জেলখানা।

(ট) কোন মুসলিম স্বামী বা মুসলিম স্ত্রী তার পাপিষ্ঠ সঙ্গীকে মদ্যশালায় উপস্থিত হতে বা নগ্ন সিনেমাহলে উপস্থিত হতে বাঁধা দিতে পারবে না। যখন তাদের কেউ বাচ্চাদের স্বভাব-চরিত্রের কথা ভেবে অপরজনকে বাধা দিতে চাবে, তখন তার জন্য অপেক্ষায় থাকবে পুলিশ।

(ঠ) যদি স্ত্রী বদদ্বীন বা অমুসলিম হয়, তাহলে সে মুসলিম-অমুসলিম যেকোন পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করলে বা তার জন্য নিজেকে উম্মুক্ত করে দিলে বা তাকে বাড়িতে ডেকে আনলে বা তার সাথে আনন্দ-ফূর্তি করলে স্বামী তাকে বাঁধা দিতে পারবে না।

ভিসার দাবি হিসাবে একজন মুসলিম কি নিজ সম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ?

এমনিভাবে পশ্চিমা দেশে একজন মুসলিম নিজ সম্পদের ব্যাপারেও নিরাপদ নয়। সম্পদের উপর তাদের সীমালঙ্ঘনের উদাহরণ অনেক:

(ক) ট্যাক্স আরোপ করা। যা থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে হত্যা করার জন্য ব্যয় করা হয়। বাধ্য ও বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া ছাড়া এই ট্যাক্স মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়া জায়েয নেই। আর এমন কোন চুক্তি মেনে নেওয়া, যেটার কারণে এই ট্যাক্স আবশ্যক হয়, তা মহা গুনাহ। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা তো কাফেদেরকে উশর (সম্পদের একদশমাংশ) দিত? তাহলে উত্তর হল, এখানে বিষয়টি ভিন্ন:

১. সেই উশর দেওয়া হত মুসলিম-কাফেরের মাঝে সমান আদান-প্রদানের স্বার্থে। ফলে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ কাফেরদের দেশে প্রবেশের সময় তাদেরকে উশর দিতেন, আবার তার সমপরিমাণই কাফের ব্যবসায়ীরাও মুসলিম দেশে প্রবেশ করার সময় মুসলিমদেরকে দিত। তাই সেটা ছিল বাজার রক্ষার স্বার্থে পরস্পর বিনিময়কৃত ট্যাক্স।

পক্ষান্তারে বর্তমানে প্রচলিত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ট্যাক্স, যেটাকে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও তাদের হত্যায় ব্যয় করে এর মধ্যে মুসলমানদের কোন স্বার্থ নেই। বরং এটা মুসলিমদের উপর নিরেট ক্ষতি, বিপদ ও জুলুম।

(২) এছাড়াও ঐ সকল ট্যাক্স, যা কাফেররা মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে নিত, সেগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজেই ব্যয় হওয়া নিশ্চিত ছিল না। পক্ষান্তরে এ সকল ট্যাক্স নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যই নেওয়া হয়। তারা তাদের রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে এগুলোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেয়। এমনিক এগুলোর নির্দিষ্ট নাম ও শতকরা হারও নির্ধারণ করে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়। তাই এগুলো হল তাদের মৌলিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মৌলিক ট্যাক্স। আর সেই শত্রু হল মুসলিমগণ।

ব্যবসায়ীদের উশর আর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ট্যাক্সের মধ্যে পার্থ্যক্য স্পষ্ট করার জন্য আমি একটি প্রশ্ন করবো।

বর্তমানে যদি কোন মুসলিম আমেরিকান বা বৃটিশ সেনাবাহিনীকে বা নর্দান অ্যালায়েন্সকে স্বেচ্ছায় নিজের সম্পদ দান করে, তাহলে তার হুকুম কী হবে বলুন তো? উত্তর সকলের জানা। সে এমন গুরুতর গুনাহে লিপ্ত হল, যা কখনো কুফরী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কখনো সে এর দ্বারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় চলে আসতে পারে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু

বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়াত দান করেন না।” (মায়িদা:৫১)

শায়খ আহমাদ শাকের রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতওয়ায় এধরণের লোকের হুকুম বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। যেটা আমি তৃতীয় পরিচ্ছেদে হুবহু তুলে ধরেছি।

সুতরাং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহিত এ সমস্ত ট্যাক্স বাধ্য হওয়া বা বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া ব্যতিত কোন মুসলিমের জন্য দেওয়া জায়েয নেই। আর যে মুসলিমের মাল কঠোরতার মাধ্যমে এবং জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়, তাকে কী নিরাপদ ধরা হবে?

(খ) যদি কোন মুসলিমের উপর অন্য কোন ব্যক্তির বা সরকারের ঋণ বিলম্বিত হয়ে যায়, যেমন সে লিজ নিল বা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিলম্ব হয়ে গেল বা এজাতীয় অন্য কোন ঋণ বিলম্বিত হয়ে গেল, তখন দেশের আইন অনুযায়ী ঋণের মুনাফা হিসাবে তাকে সুদ দিতে হয়। সে এই দলিল দিতে পারে না যে, এটা আমার উপর অর্থনৈতিক জুলুম। কারণ সুদ হারাম। আর ভিসার আমান অনুযায়ী আপনারা আমার উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ করার অধিকার রাখেন না।

(গ) পশ্চিমে বসবাসকারী অনেক মুসলিমের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্য কেউ যে তাকে কিছু দান করবে, সেটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে অনেকের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে জাতিসঙ্ঘের অনুমোদনক্রমে। তার বিরুদ্ধে কোন ধরণের অভিযোগ উত্থাপন বা কোন দলিল উপস্থাপন করা ব্যতিতই। এমনিভাবে অনেক জনকল্যাণমূলক বা সামাজিক সংগঠনের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যারা ফিলিস্তীন ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। এসব মুসলিমদের কাছে ভিসা বা রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ বা বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের পরিস্কার অনুমোদন থাকাও তাদেরকে সম্পদ বাজেয়াপ্ত

করতে বাঁধা দেয়নি। বরং পশ্চিমারা মনে করে, ঐ সকল লোক তাদের দেশে বসবাস করে, আর তারা তাদের দেশে যেকোন আইন পাস করতে পারে, যেকোন নিয়ম জারি করতে পারে। শুধুমাত্র উক্ত আইনটি অধিকাংশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মতিতে হলেই হয়।

এর উদাহরণসমূহের মধ্যে একটি হল, ড. মূসা আবু মারযুকের ঘটনা, যাকে হামাসের জন্য অর্থ জোগানোর অভিযোগে আমেরিকায় কারাবন্দী করা হয়। এমনিভাবে আবু মাহমুদ আস-সুরীর ঘটনা, যিনি চেচেন জনগণের জন্য অর্থ যোগানের অভিযোগে এখনো পর্যন্ত আমেরিকার কারাগারে বন্দী আছেন।

আরো একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমেরিকা মনে করে, হামাস ও অন্যান্য জিহাদী দলগুলো সন্ত্রাসী গ্রুপ। তাদের জন্য অনুদানের অর্থ জোগাড় করা বৈধ নয়। যে এমনটা করবে তাকে জেলে ভরা হবে বা শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ তারা তাদের দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের থেকে জোর করে বলপূর্বক অর্থ নেওয়াকে নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে, যেটা তারা প্রকাশ্যে ইসরাঈলের স্বার্থে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপরাধযজ্ঞ সংঘটন, তাদেরকে হত্যা ও তাদের দেশে আগ্রাসন চালানোর কাজে ব্যয় করে। তাহলে এটা কোন আমান?

বরং এর থেকেও আরো জঘন্য হল, তারা ইসরাঈলের জন্য অনুদান সংগ্রহ করাকে মহা পূণ্যের কাজ মনে করে। এক্ষেত্রে তারা পরস্পর প্রতিযোগীতা করে।

এই ভিসা অনুযায়ী একজন মুসলিম কি তার দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ?

(ক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া একজন মুসলিমের দ্বীন ও আকিদার উপর প্রলয়ংকারী আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘন। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মত রাষ্ট্রগুলো শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি

দেওয়ার অনুমতিই দেয় না, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালিদাতাকে সম্মানিত করে, তাকে বাহাদুরদের মধ্যে একজন বাহাদুর বলে গণ্য করে। যেমন সালমান রুশদীকে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে একাধিক পুরস্কার দেওয়া হয়। বিল ক্লিনটন তাকে হোয়াইট হাউসে অভ্যর্থনা জানায়। ব্রিটেনের রাণী তাকে ‘নাইট’ উপাধি প্রদান করে।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদান সকল আমান বাতিল করে দেয়। যার সম্পর্কে আলোচনা কিতাবের পরিশিষ্টে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পশ্চিমা সরকার ও জনগণ মনে করে, যেকোন লেখক বা নাট্যকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে। যেমনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যঙ্গকারী কার্টুনে হয়েছিল। যেটা কয়েকটি পশ্চিমা দেশে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সমস্ত দেশের সরকার এ সমস্ত অপরাধীদের ব্যাপারে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা জারি করতেও রাজি নয়।

আর কোন সম্প্রদায়ের কিছু লোক চুক্তি ভঙ্গ করলে আর বাকিরা তাদের সমর্থন করলে, সকলের নিরাপত্তাই বাতিল হয়ে যায় এবং সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়। যেমনটা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যদি বলা হয়, মুসলমানদের ইতিহাসে তো এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে মুসলিমগণ আমান (নিরাপত্তা) নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করেছেন, অথচ তারা জানতেন যে, সেখানে ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদানকারী লোক আছে? তাহলে উত্তর হবে: **হ্যাঁ। কিন্তু তাদের উক্ত গালি দানকারীদেরকে হত্যা করার অধিকারও ছিল।** যদিও তারা সেই ভিসা সংগ্রহ করুক না কেন, যেটাকে আমরা নিরপত্তা বলে মানি না। এমনকি যদি তারা বিশুদ্ধ, পরিস্কার ও শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা চুক্তিও করে তথাপিও। যেমনটা সামনে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তাই যেকোন মুসলিম, যদি ভিসা বা তার থেকে স্পষ্ট কোন নিরাপত্তা নিয়েও প্রবেশ করে, তবুও তার জন্য সালমান রুশদী বা ঐ সকল কার্টুন নির্মাণকারীদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে, যারা ভিসা বা নিরাপত্তা চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য করা ব্যতিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে।

আর এ হুকুম শুধু গালিদানের সাথে সরাসরি জড়িত লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ উপাদান পর্যন্ত এ হুকুম বিস্তৃত হবে। আল্লাহর সাহায্যে তার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থাৎ যদি পুরো একটি রাষ্ট্র বা একটি দেশের সমস্ত জনগণ মিলেও এই গালিদানে লিপ্ত হয় অথবা সকলে অংশগ্রহণ করে বা সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করে, তবে একজন মুসলিমের জন্য তাদের সকলের মোকাবেলা করা জায়েয। আর তার মাঝে ও ঐ সংগঠনের মাঝে যেকোন ধরণের নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। চাই ওই নিরাপত্তা চুক্তি ভিসা হোক (যেটাকে আমরা নিরাপত্তা চুক্তি বলে মানি না।) অথবা অন্য কোন পদ্ধতির নিরাপত্তা চুক্তি হোক।

(খ) বর্তমানে বিদ্যমান সন্ত্রাসবিরোধী আইন, শুধু সন্ত্রাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কারণেও ধরপাকড় করে। অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে জিহাদ করার আহ্বান করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(গ) পশ্চিমে বসবাসকারী কোন মুসলিম কুরআনে বর্ণিত ইহুদীদের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ্যে বর্ণনা করতে পারবে না। অন্যথায় তাকে সেমেটিকদের বিরুদ্ধে শত্রুতার (অ্যান্টি সেমিটিসম) অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হবে।

(ঘ) যেকোন দেশের মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করা মানে সর্বস্থানের মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করা। আর সামনে এই আলোচনা আসবে যে,

মুসলমানদের উপর সীমালঙ্ঘন নিরাপত্তা তথা আমান বাতিল করে দেয়। যেমন আলোচনা আসবে যে, যখন হারবীরা মুসলিমদের কোন দলকে বন্দী করবে, তখন দারুল হারবে নিরাপত্তা গ্রহণ করে অবস্থানরত মুসলিদের নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাবে।

(ঙ) যেকোন দূতাবাসে ভিসার আবেদন করতে গেলে অনেকগুলো শর্ত সংবলিত একটি ফরম পূরণ করতে হয়। তার শেষে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হয় যে, এ সকল কথা সঠিক। **অথচ তার কোন একটি ধারাও দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র থেকে বা ভিসা প্রত্যাশী থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেওয়ার ব্যাপারে নেই। এমনকি তারা তাদের আইন মেনে চলবে কি না সেটার কথাও উল্লেখ নেই।**

(চ) আর এ কথা বলা যে, ভিসা বহনকারী ব্যক্তি ভিসা প্রদানকারী রাষ্ট্রের সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার বিষয় প্রচলনগত- এর জবাব হল, ইতিপূর্বে **উল্লেখকৃত উদাহরণগুলো এর বিপরীত অবস্থার দলিল**।

(ছ) এমনকি যদি আমরা মেনেও নেই যে, ভিসা একটি পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি, তবুও এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তারা যে নিরাপত্তাচুক্তি প্রদান করে, তা ঐ সমস্ত শরীয়ত বিরোধী কানুন থেকে মুক্ত থাকে না, যেগুলো তারা তাদের মাঝে বসবাসকারী বা প্রবাস যাপনকারীদের উপর আরোপ করে থাকে। এমনিভাবে তাদেরকে ট্যাক্স দেওয়ার শর্ত থেকেও মুক্ত থাকে না। আর তাদেরকে ট্যাক্স দেওয়ার মাঝে মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘনে তাদেরকে সাহায্য করা হয়। যেই তাদের দেশে সফর করে, সেই সফরের পুর্বে এটা জানতে সক্ষম।

তাই আমরা যদি মেনেও নেই যে, সে সন্তুষ্টিক্রমে এর উপর চুক্তি করেছে, তাহলে উত্তর হল, সে গুরুতর গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। বাধ্য ও বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া ব্যতিত তাদেরকে ট্যাক্স দেওয়া জায়েয নেই। সন্তুষ্টি ও চুক্তির মাধ্যমে এটা দেওয়া জায়েয নেই। এ হিসাবে পশ্চিমা দেশে ভ্রমণকারী বা

সেখানে বসবাসকারী প্রত্যেকেই ভিসা গ্রহণের মাধ্যমে মহা গুনাহে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে আমরা যদি ধরি, ভিসা হল শুধু অতিক্রম করা ও প্রবেশ করার অনুমতি। সেক্ষেত্রে এটার আবেদন করাতে এসকল ফলাফলগুলো আবর্তিত হয় না।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ কে দারুল হরবে ব্যবসা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

"মাসআলা ১৫৬৮: *যদি মুসলিম ব্যবসায়ীগণ দারুল হরবে প্রবেশ করলে সেখানে লাঞ্ছিত হয় এবং তাদের উপর কাফেরদের বিধি-বিধান প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাদের জন্য দারুল হরবে ব্যবসা করা হারাম। তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হবে। আর এমন না হলে আমরা এটাকে শুধু মাকরুহ মনে করব। তবে আর তাদের সাথে বেচা-কেনা জায়েয হবে। তবে যে সব বস্তু দ্বারা তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করবে, যেমন অস্ত্র, লৌহ বা এজাতীয় দ্রব্য, এধরণে কোন কিছু তাদের নিকট বিক্রয় করা আদৌ জায়েয হবে না।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"(হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (আলে ইমরান:১৩৯)

তাই তাদের নিকট এমনভাবে প্রবেশ করা, যাতে প্রবেশকারীর উপর তাদের বিধি-বিধান জারি হয়, এটা দুর্বলতা, হীনমন্যতা ও সন্ধির আহ্বান। এটা হারাম। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগীতা করবে না।" (মায়িদা:২)

তাই তাদেরকে বেচা-কেনা বা অন্য যেসকল মাধ্যমে তারা মুসলিমদের উপর শক্তিশালী হয়, সেগুলোর মাধ্যমে শক্তিশালী করাও হারাম। যে এমনটা করবে, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে এবং অতি দীর্ঘ সময় ধরে তাকে আটক রাখা হবে।"[৩]

(জ) তারপর কথা হল, যদি ভিসা নিরাপত্তা হয়, তাহলে চুক্তি তো দুই/তার অধিক পক্ষের মাঝে হয়। আর যারা এটাকে চুক্তি মনে করে, সে অবস্থায় এ চুক্তিটা হয় ভিসা গ্রহণকারী ব্যক্তি ও ভিসা প্রদানকারী রাষ্ট্রের মাঝে। আর তাদের কথা অনুযায়ী এটা উভয়পক্ষের উপরই কিছু নিয়ম-কানুন আবশ্যক করে। যখন এক পক্ষ ঐ সকল নিয়ম-কানুনের কোনটা লঙ্ঘন করে, তখনই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। লেখক ভিসা বহনকারীর কর্তব্যগুলো সম্পর্কে কথা বলেছেন, কিন্তু ভিসা প্রদানকারী রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং যারা এটাকে চুক্তি মনে করে, তাদের মতে এটা ভঙ্গ করলে কী ফলাফল হবে সে সম্পর্কে কোন কথা বলেননি!

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ কাফেররা মুসলিম বন্দীদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর গাদ্দারি করলে তার সম্পর্কে সম্পর্কে বলেন:

"৭৮৪- যদি কাফিরদের কোন দল মুসলিম বন্দীদের সাক্ষাত পায় আর তাদেরকে বলে: তোমরা কারা? জবাবে তারা বলে, আমরা ব্যবসায়ী লোক যারা তোমাদের লোকদের থেকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করেছি, অথবা বলে, আমরা খলীফার দূত - তাহলে এমন বলা মুসলিমদের জন্য ঐ কাফিরদের

৩ আলমুহাল্লা- ৯/৬৫

কাউকে হত্যা করা জায়েয হবে না। কারণ তারা যা প্রকাশ করেছে, তা নিরাপত্তা গ্রহণের স্বাভাবিক দলিল। সুতরাং এর কারণে তারা মুস্তামিন (নিরাপত্তা গ্রহণকারী) বলে বিবেচিত হবে। তাই এরপর আর তাদের জন্য তাদের সাথে গাদ্দারি করা জায়েয হবে না, যদি না হরবীরা তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

৭৮৫- অত:পর যদি আহলুল হারব জানতে পারে যে তারা বন্দী। ফলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। অত:পর মুসলিমরা তাদের থেকে পলায়ন করে চলে যায়। তখন এসকল মুসলিমদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের মাল ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয আছে।

কারণ কাফিররা পরে যা করেছে (মুসলিমদের বন্দী করা), তা দ্বারা নিরপত্তাচুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

যেমন আমরা দেখতে পাই যে, যদি দারুল হারবের বাদশা তাদের সাথে গাদ্দারি করে, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাদেরকে বন্দী করে, অত:পর বন্দী মুসলিমরা পালিয়ে যায়, তখন তাদের জন্য আহলুল হারবের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয আছে। যেহেতু এটা বাদশার পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ বলে গণ্য।

৭৮৬- এমনিভাবে **যদি কোন লোক বাদশার আদেশে বা তার জ্ঞাতসারে তাদের সাথে এমন আচরণ করে আর বাদশা তাকে তা থেকে বাঁধা না দেয়, তাহলেও একই হুকুম।** কারণ নির্বোধকে নিষেধ না করা মানে আদেশ করা।

পক্ষান্তরে যখন তারা তাদের আমির বা জামাতের অজান্তে এমনটা করে, তখন মুস্তানমিনদের জন্য এদের কাজের কারণে তাদের কওমের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করা জায়েয হবে না। ”[৪]

---

৪ আসসিয়ারুল কাবির- ২/৫১০-৫১১

(ঝ) যদি বলা হয়, আপনি যা কিছু উল্লেখ করলে, আমরা তার সব কিছুই মেনে নিলাম যে, কাফেররা ভিসা নিয়ে প্রবেশকারীর জান মাল ও পরিবারের উপরও আক্রমণ করে। কিন্তু যে ভিসা নিয়ে তাদের কাছে যায়, সে তো পূর্ব থেকেই এগুলো জানে এবং সে এগুলো মেনেও নেয়। সুতরাং এটা তার মাঝে এবং উক্ত দেশের মাঝে অঘোষিত একটি সামাজিক চুক্তি। তাই তা রক্ষা করা আবশ্যক?

তার উত্তর হল: তাহলে আপনাদের কথা দ্বারাই বুঝা যায় যে, যে বিষয়ের উপর চুক্তি হয়েছে, সেটা ঐ নিরাপত্তাচুক্তি বা আমান নয়, যেটা ফুকাহাদের মাঝে পরিচিত। বরং এটা হল এমন একটি অবস্থা যখন একজন মুসলিম নিজের জান, মাল, পরিবার ও দ্বীনের ব্যাপারে হুমকির সম্মুখীন থাকে। **আর আপনাদের এই স্বীকারোক্তিই ভিসা নিরাপত্তাচুক্তি হওয়ার সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং এখানে কোন নিরাপত্তা চুক্তি হয় না আর একারণে এর মোকাবেলায় মুসলমানের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যক নয়। তাই যেমনিভাবে তারা মুসলিমদেরকে জান, মাল, ইজ্জত ও দ্বীনের ব্যাপারে হুমকির মধ্যে রেখেছে, তেমনিভাবে মুসলিমদের জন্যও তাদেরকে হুমকির মধ্যে রাখা বৈধ।**

(ঞ) এখন যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করলেন, তথা ভিসার বহনকারী মুসিলমদের উপরও সর্বপ্রকার আক্রমণ হয়, এটা তো যারা তাদের দেশের বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে হয়। পক্ষান্তরে সেখানে সামান্য অবস্থানকারী মুসাফিরের ক্ষেত্রে তো এসকল বিষয় হয় না।

তার উত্তর:

(১) আমি যে সমস্ত আক্রমণগুলোর কথা বলেছি, তার অধিকাংশগুলোর ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন অবস্থান আর স্বল্পমেয়াদে অবস্থানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষ করে কারারুদ্ধ করা বা নির্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে।

(২) আমি শায়খ আবু হাজের আল-ইরাকী, শায়খ মুহাম্মদ আলমুআইয়াদ ও শায়খ মুহাম্মদ আন-নাফে সুদানী (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!) এর উদাহরণ পেশ করেছি। এদেরকে তাদের দেশে প্রবেশের সাথে সাথেই বা সামান্য সময়ের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়ছে। আর কারো কারো ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের সুবিধার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করা হয়েছিল।

(৩) তারপর প্রশ্ন হল, দীর্ঘ অবস্থানাকারীর উপর আক্রমণ করা বৈধ আর স্বল্পমেয়াদে উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়, এমন কোন নিয়ম আছে কি?

(ট) যারা ভিসাকে নিরাপত্তা মনে করেন, তাদেরকে আমি আবেদন করব, তারা আমেরিকা বা পশ্চিমা সংবিধান বা আইন-কানুনের একটি ধারা উল্লেখ করুন, যার দ্বারা একথা বুঝা যায় যে ভিসা বহনকারীর জান, মাল, ইজ্জত ও দ্বীনের উপর কোন ধরণের সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয় এবং সে তার সাথে বহনকৃত ভিসার কারণে তাদের ঐ সমস্ত আইন-কানুন থেকে নিরাপদ, যেগুলো বিভিন্ন প্রকার জুলুমকে বৈধতা দিয়েছে, যেমন আমি এর আগে উদাহরণে উল্লেখ করেছি। আর এক্ষেত্রে অন্য কোন আইনের ভূমিকা নেই এবং যদি তারা ভিসা বহনকারী থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করে, তবে তাদের শুধু এতটুকু অধিকারই আছে যে, তাকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিবে। তথাপি তার ইচ্ছায়, তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নয়?

(ঠ) শরীয়তের সাধারণ মূলনীতি হল, **কাফেরদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হালাল**। শুধুমাত্র সন্ধি বা নিরাপত্তা চুক্তি বা যিম্মাচুক্তির অধিনে তা সংরক্ষিত ও হারাম হতে পারে। কারণ শত্রুর দেশ হল যুদ্ধ, দখলদারি ও অবাধে ব্যবহার করার দেশ।[৫]

তাই যে দাবি করবে ভিসা নিরাপত্তা চুক্তি, তার এ ব্যাপারে পরিস্কার, স্পষ্ট ও বিরোধমুক্ত দলিল পেশ করতে হবে। অন্যথায় মূল অবস্থাই বহাল থাকবে।

---

৫ আসসিয়ারুল কাবির ও তার শরাহ- ১/৩৫৫, ৩/৯১৫, আসসাইলুল জারার- ৪/৫৫১

যদি আমরা মেনেও নেই যে, ভিসা একটি নিরাপত্তা চুক্তি, তাহলে আরেকটি প্রশ্ন হল, কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমের নিরাপত্তা থাকার কারণে কি মুসলিমের পক্ষ থেকেও কাফেরের নিরাপত্তা থাকা আবশ্যক হয়?

এ মাসআলায় ফুকাহাদের দু'টি মত রয়েছে। লেখক ইলমী আমানত রক্ষা না করে শুধুমাত্র একটি মত উল্লেখ করেছেন।

(ক) প্রথম মত: এটা হল জুমহুর (ব্যাপক সংখ্যক) ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত। তা হল, কেউ নিরাপত্তা নিয়ে দারুল কুফরে প্রবেশ করলে কাফেররাও তারা থেকে নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যখন কোন মুসলমান দল নিরাপত্তানামা নিয়ে কাফেরদের দেশে প্রবেশ করে, তখন সে উক্ত দেশ ত্যাগ করা বা নিরাপত্তার মেয়াদ পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত শত্রুরাও তার থেকে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। তাদের জন্য তাদের উপর আক্রমণ করা বা তাদের সাথে গাদ্দারি করা জায়েয নেই।

যদি শত্রুরা মুসলিমদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে, তথাপি আমি তার জন্য শত্রুদের সাথে গাদ্দারি করা পছন্দ করি না। বরং আমি তাদের জন্য এটাই পছন্দ করি যে, তারা তাদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিবে এবং তাদের চুক্তি সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে তাদের দিকে ছুড়ে মারবে। এটা করার পর মুসলিমদের নারী ও শিশুদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"[৬]

---

৬ আল-উম্ম- ৪/২৬৩

তিনি আরও বলেন:

"যখন কোন মুসলিম লোক নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে, অত:পর সেখানে নিজের স্ত্রীকে অথবা অন্য কোন মুসলিমের স্ত্রীকে বা নিজের সম্পদ অথবা অন্য কোন মুসলিমের সম্পদ দেখতে পায়, যেগুলো মুশরিকরা তাদের থেকে ছিনতাই করে নিয়েছিল, **তাহলে এদেরকে নিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে। এই হিসাবে যে এগুলো শত্রুর মালিকানাধীন নয় এবং যদি তারা এ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করত, তাহলেও এগুলো তাদের হত না। তাই এটা খেয়ানত ও গাদ্দারি নয়। যেমন, যদি এমন কোন মুসলিমের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হত, যে অন্য কোন মুসলিমের মাল ছিনতাই করেছে, ফলে সে উক্ত তার অজ্ঞাতসারে উক্ত মাল নিয়ে তার মালিকের নিকট সোপর্দ করে, তাহলে এটা খেয়ানত হত না। খেয়ানত হল, যেটা গ্রহণ করা বৈধ নয়, সেটা গ্রহণ করা।**

কিন্তু যদি সে কাফেরদের কোন সম্পদের উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে যায়, তাহলে তার কিছুই নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। কারণ যখন সে তাদের থেকে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে, তখন তারাও তার থেকে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে।"[৭]

আদ-দুররুল মুখতারের লেখক বলেন:

"মুস্তামিন তথা নিরাপত্তা প্রার্থীর মাসআলা - সে হল, যে অন্য দেশে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক। কোন মুসলিম দারুল হরবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করেছে, তাহলে তার জন্য হারবীদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হারাম।"[৮]

---

৭ আলউম্ম- ৪/২৮৪

৮ আদ-দুররুল মুখতার- ৪/১৬৬

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, “মাসআলা: যে শত্রু দেশে আমান নিয়ে প্রবেশ করে, সে তাদের সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোনরূপ গাদ্দারী করতে পারবে না বা তাদের সাথে সুদি লেন-দেনও করতে পারবে না।

....

আর তাদের সাথে খেয়ানত করা হারাম। কারণ তারা তাকে শর্তযুক্ত নিরাপত্তা দিয়েছে, যে শর্ত লঙ্ঘন করলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করা হবে এবং যেহেতু এতে তার পক্ষ থেকেও তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এটা যদিও শব্দের মধ্যে উল্লেখ নেই, কিন্তু অর্থগতভাবে এটা জানাশোনা। এজন্য **কাফেরদের কেউ যদি আমাদের দেশে নিরাপত্তা নিয়ে আসার পর আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী হবে।**

তাই যখন এটা প্রমাণিত হল, তখন তার জন্য তাদের সাথে খেয়ানত করা জায়েয হবে না। কারণ এটা হল গাদ্দারী। আর আমাদের দ্বীনের মধ্যে গাদ্দারী করার কোন সুযোগ নেই।”[৯]

ইমাম শাফিয়ী ও ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ***“নিরাপত্তার মোকাবেলায় নিরাপত্তা”*** এর থেকে বুঝা যায়, যে ভিনদেশীকে নিজ দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং তাকে যেকোন ধরণের জুলুম থেকে নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়, সে উক্ত ভিনদেশী থেকে এটা আশা ও কামনা করে যে উক্ত ভিনদেশীও যাদের মাঝে প্রবেশ করল তাদের উপর কোনরূপ আক্রমণ করবে না। এটা একটা প্রচলনগত চুক্তি। **এর উপর ভিত্তি করে এটাও সঙ্গত হবে যে, কেউ কোন ভিনদেশীকে নিজ দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পর তার উপর আক্রমণ করে দিলে উক্ত ভিনদেশী থেকেও তার উপর পাল্টা আক্রমণ না করার আশা ও কামনা করা যাবে না। অর্থাৎ**

---

৯ আলমুগনি- ৯/২৩৭

নিরাপত্তার মোকাবেলায় নিরাপত্তা এবং সীমালঙ্ঘনের মোকাবেলায় সীমালঙ্ঘন।

এছাড়া কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমকে নিরাপত্তা দেওয়ার অনিবার্য দাবি হল মুসলিমের পক্ষ থেকেও কাফের নিরাপত্তা লাভ করা- একথার মধ্যে আমাদের পক্ষেই দলিল রয়েছে। **যেহেতু যদি কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমের নিরাপত্তা না থাকে, বরং মুসলিম নিজ জান, মাল ও ইজ্জতের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, তাহলে উক্ত মুসলিমের উপরও কাফেরকে নিরাপত্তা দেওয়া আবশ্যক নয়।**

এ মতটি ইমাম শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ বন্দীদের ব্যাপারে যে মত উল্লেখ করেছেন, যাদের সাথে কাফেররা বা তাদের শাসক বা তার প্রতিনিধি গাদ্দারি করে - যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম সেটাকেই সমর্থন করে।

(খ) দ্বিতীয় মত: এটা হল ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ এর মত।

তিনি 'হাদায়িকুল আযহার' কিতাবের লেখকের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন:

"তার বক্তব্য-"তাদের পক্ষ থেকে মুসলিমকে নিরাপত্তা প্রদান মানে মুসলিমের পক্ষ থেকেও তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান"- আমি বলবো, দুই নিরাপত্তার মাঝে কোন আবশ্যকীয় যোগসূত্র নেই। শরয়ীভাবেও নয়, যৌক্তিকভাবে নয় এবং প্রচলনগতভাবেও নয়। সুতরাং আহলে হরবের নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশকারী মুসলিমের জন্য **যতটুকু সম্ভব তাদের সম্পদ নিয়ে নেওয়া এবং যতটুকু সম্ভব তাদের রক্তপাত করা বৈধ**।"[১০]

ইমাম মাওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহ দাউদে যাহিরী রহঃ থেকে এটা উল্লেখ করে বলেন:

---

১০ আসসাইলুল জারার- ৪/৫৫২ ও ৫৫৩

“যখন কোন মুসলিম আমান নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে অথবা তাদের মাঝে বন্দী হিসাবে থাকে, পরে তারা তাকে মুক্ত করে নিরাপদ করে দেয়, তখন তার জন্য তাদের জান মালের উপর আকস্মিক আক্রমণ করা জায়েয নেই। বরং তার উপরও আবশ্যক তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। আর দাউদ বলেছেন, তার জন্য তাদের জান-মালের উপর আক্রমণ করা জায়েয হবে। তবে যদি তারাও তার থেকে নিরাপত্তা চেয়ে রাখে, তখন উভয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আবশ্যক হবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা তার উপর হারাম হবে।”[১১]

এ মতটিই শক্তিশালী। এতে তিনি হুকুমের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি-নীতি ধর্তব্য বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা যদি ভিসার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি দেখি, তাহলে দেখতে পাই, এটা এক পক্ষ থেকেই প্রদান করা হয়। এর দ্বারা যৌথ চুক্তি সম্পাদিত হয় না। আর যদি চুক্তি সম্পাদিত হতও, তথাপি সেটা বাতিল হয়ে যেত।

---

১১ আল-আহকামুস সুলতানিয়া- ১/২৭৮

আমরা যদি মেনে নেই যে, কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলিমকে নিরাপত্তা প্রদান, মুসলিমের পক্ষ থেকেও কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান আবশ্যক করে, তাহলে প্রশ্ন হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণের পরিস্থিতি পর্যন্তও কি এই নিরাপত্তাচুক্তি গড়াবে?

উত্তর হল, না। আমি সামনের কয়েকটি শিরোনামের মধ্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ।

(ক) পবিত্র সুন্নাহর প্রমাণাদি এর উপরই পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কানী দেয় মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় সে অন্যকে নিরাপত্তা দিলেও সে নিজে নিরাপদ থাকবে না।

১) কা'ব ইবনে আশরাফের ঘটনা।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন:

রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কা'ব ইবনে আশরাফের মোকাবেলা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চাচ্ছেন আমি তাকে হত্যা কর ফেলি? বললেন:

হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. বললেন, তাহলে **আমাকে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুমতি দিন!** বললেন: বলতে পার। অত:পর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কা'বের নিকট এসে বললেন: এই লোকটি আমাদের থেকে সদকা চাচ্ছে। **সে আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার থেকে কিছু ঋণ চাইতে।** কা'ব বলল: আল্লাহর শপথ! সামনে তোমরা তার প্রতি আরো বিরক্ত হবে। তিনি বললেন: আমরা তো তার অনুসারী হয়ে গেছি, তাই এখন তার বিষয়টা কোন দিকে গড়ায় সেটা দেখার আগ পর্যন্ত তাকে ছাড়তে চাচ্ছি না। তাই আমি চাচ্ছি, তুমি আমাকে এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাক ঋণ দাও।

কা'ব বলল: আচ্ছা দিব, তাহলে আমার নিকট কিছু বন্ধক রাখ। তারা বললেন, তুমি কি জিনিস চাও? বলল: তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। বললেন: আমাদের স্ত্রীদেরকে কিভাবে তোমার নিকট বন্ধক রাখব, কারণ তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ?

বলল: তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। বললেন: কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে তোমার নিকট বন্ধক রাখব? কারণ এতে মানুষ তাদেরকে গালি দিয়ে বলবে, এক ওয়াসাক বা দুই ওয়াসাক খাদ্যের জন্য তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জাস্কর হবে। বরং আমরা তোমার নিকট আমাদের তরবারীগুলো বন্ধক রাখি।

অত:পর তারা তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেলেন যে, রাতে ফিরে আসবেন। রাতের বেলা তিনি আসলেন। তার সাথে ছিলেন আবু নায়িলা। তিনি ছিলেন কা'বের দুধ ভাই। **কা'ব তাদেরকে দূর্গের দিকে আসার আহ্বান জানাল।** অত:পর কা'ব নিচে নেমে আসল। তখন কা'বের স্ত্রী বলল: আপনি এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? বলল: এ তো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়িলা! হাদিসের বর্ণনাকারী আমর ব্যতিত অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ এও বলেন যে: কা'বের স্ত্রী বলল: আমি একটি আওয়ায শুনতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন, তার থেকে রক্ত টপকে টপকে পড়ছে। কা'ব বলল: আরে... এ

তো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়িলা। সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে রাতের বেলা কোন দুর্যোগের কারণে ডাক দিলে সাড়া দিতে হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা প্রবেশ করলেন। তার সাথে প্রবেশ করল আরো দু'জন লোকও।

....

তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, যখন সে আসবে, **আমি তার চুলের খুশবুর প্রশংসা করে তার ঘ্রাণ নিতে থাকব। তোমরা যখন দেখবে, আমি তার মাথা মজবুতভাবে ধরে ফেলেছি, তখনই তোমরা ঝাপিয়ে পড়বে। তার উপর আঘাত হানবে।** তিনি আরেকবার বলেন, অত:পর আমি তোমাদেরকেও ঘ্রাণ শোঁকাবো।

কা'ব চাদর পরিধান করে তাদের নিকট নেমে আসল। তার দেহ থেকে খুশবু ছড়াচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন: আমি আজকের মত এত ঘ্রাণ আর পাইনি। অর্থাৎ সুঘ্রাণ। আমর ব্যতিত অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেন: কা'ব বলল: আমার নিকট আরব রমনীদের সবচেয়ে সুঘ্রাণ বিশিষ্ট ও সবচেয়ে গুণবতী রমনী আছে। আমর বলেন, তিনি বললেন: **আমাকে তোমার মাথা থেকে ঘ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দিবে?** কা'ব বলল: হ্যাঁ, নিতে পার। তিনি ঘ্রাণ নিলেন এবং তার সাথীদেরকেও শোঁকালেন। অত:পর আবার বললেন: **আমাকে আবার ঘ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দিবে? বলল: হ্যা।** অত:পর তার মাথা দৃঢ়ভাবে ধরা হয়ে গেলে তিনি সাথীদেরকে বললেন: আঘাত করো! তারা আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। অত:পর সকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনার বর্ণনা দিলেন।"[১২]

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তার সাথীগণ অনেকগুলো কাজ করেছেন। **তারা এমন ধরণের কথা বলেছেন, যেগুলো কা'ব ইবনে আশরাফের মনে নিরাপত্তার ধারণা সৃষ্টি**

---

১২ সহিহ বুখারি- হাদিস- ৩৭৪১

করবে। এভাবে তারা তাকে ধোঁকা দেন। তার নিকট তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলেননি। তবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও স্পষ্টভাবে বলেন নি। আর তার পক্ষ থেকে তাদেরকে কথাবার্তা বলার, দূর্গে প্রবেশ করার এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ ভিসার বিনিময়ে যেটা দেওয়া হয়। ফলে তারা এই অনুমতিকেই তাকে হত্যার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেন।

নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো দ্বারা উপরোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়:

(ক) তারা কা'বের সামনে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা করে বলেছেন: সে আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর প্রকাশ্য কথাটি কুফর। তবে যদি তারা মনে মনে অন্য কোন অর্থ লুকিয়ে রেখে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন, তারা জিহাদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, যার মধ্যে কষ্টের কারণে তাদের জন্য সওয়াব ও পুরস্কারও থাকে, বা এজাতীয় কোন অর্থ উদ্দেশ্য নিলে।[১৩] এ অবস্থাটির উদাহরণ হল, যেমন আজকে একজন মুজাহিদ আমেরিকায় এসে তাদের সামনে বলল: সন্ত্রাসীরা তো আমাদেরকে চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, ক্লান্ত করে ফেলেছে, আমরা তোমাদের থেকে ঋণ চাচ্ছি। যেন এর মাধ্যমে তাদের মাঝে প্রবেশ করে তাদের উপর আঘাত হানতে পারি। এ বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়েছে।

(খ) তারা কা'বের কাছে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। বরং তারা বলেছেন, তারা ঋণ চাচ্ছেন। এর উদাহরণ হল, যেমন একজন ব্যক্তি যুদ্ধরত শত্রুদের দেশে গিয়ে তাদের কাছে যাওয়ার অবাস্তব কারণ প্রকাশ করল। যেমন শত্রুদের দূতাবাস থেকে একটি ভ্রমণ ভিসার আবেদন করল। উদ্দেশ্য হল, তাদের অপরাধীদের হত্যা করা, ভ্রমণ করা উদ্দেশ্য নয়।

---

১৩ শরহুল বুখারি লিইবনি বাত্তাল- ৯/২৪৭, ফাতহুল বারী- ৯/২৫০

একারণেই ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ কা’বের হত্যার ঘটনা থেকে অর্জিত মাসআলাসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেন:

“এতে যুদ্ধে প্রয়োজনে এমন কথা বলার বৈধতা পাওয়া যায়, যার প্রকৃত অর্থ বক্তার উদ্দেশ্য নয়।”[১৪]

আর আমাদের ভাইয়েরা ভিসা নেওয়ার সময়ও মিথ্যা কথা বলেননি। বরং তারা কৌশলপূর্ণ কথার আশ্রয় নিয়েছেন। **কারণ তারা একথা বলেননি যে, তোমরা আমাদের থেকে নিরাপদ, আর তারপরও তাদেরকে হত্যা করেছেন। বরং তারা বলেছেন: আমরা শিক্ষার জন্য এসেছি। আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিমান চালানো শিখা, যেন তোমাদেরকে হত্যা করতে পারেন। তারা আরো বলেছেন: আমরা ভ্রমণের জন্য এসেছি। আর মুসলিম উম্মাহর সিয়াহা বা ভ্রমণ হল জিহাদ। তারা বলেছেন: আমরা ব্যবসার জন্য এসেছি। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এটা জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানকারী ব্যবসা।**

(গ) তিনি তাদের নিকট অস্ত্র বন্ধক রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফলে দ্বিতীয়বার তার নিকট অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যেন কৌশল পূর্ণ হয়।

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“ইবনুত তীন বলেন: ইমাম বুখারি যে বিষয়ের অধ্যায় সাজিয়েছেন (ইমাম বুখারি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন – আমান হিসাবে অস্ত্র বন্ধক রাখা), এই হাদিসে তার প্রতি ইঙ্গিত নেই। কারণ **তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ধোঁকা দেওয়া**। অস্ত্র বন্ধক রাখার বৈধতা বুঝা যায় তার পূর্বের হাদিস থেকে। তিনি বলেন: আর অস্ত্র বিক্রয় বা বন্ধক রাখা যাবে এমন কাফেরের নিকট, যার সাথে সর্বসম্মত যিম্মাচুক্তি রয়েছে। কা’বের সাথে যিম্মাচুক্তি ছিল। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তার চুক্তির মধ্যে ছিল, সে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কাউকে সাহয্য করবে না। কিন্তু সে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এজন্যই

---

১৪ ফাতহুল বারী- ৭/৩৪০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন: সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।”

ইবনুত তীনের আপত্তির উত্তর দেওয়া হয় এভাবে যে, যদি তাদের মাঝে যিম্মিদের নিকট অস্ত্র বন্ধক রাখার প্রচলন না থাকত, তবে তারা তার নিকট এ প্রস্তাব দিত না। **কারণ যদি এমন বিষয়ের প্রস্তাব দেয়, যা তাদের মাঝে প্রচলিত নেই, তাহলে তার মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তার কৌশলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।**

তাই যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধোঁকা দেওয়া, তাই তারা তার মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি করলেন যে, তাদের সাথে যে কাজ করা বৈধ, তারা কা'বের সাথে সে কাজই করবেন। ফলে এই কৌশলের কারণে কা'ব তাদের সাথে একমত হয়ে গেল। যেহেতু সে পূর্ব থেকে তাদের সত্যবাদিতার ব্যাপারে জানত। এভাবে কৌশল পূর্ণ হল। আর তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়টির ব্যাপারে **সে ঘোষণা দেয় নি বা তারাও তার ব্যাপারে এমন ঘোষণা দেননি**।[১৫]

এর উদাহরণ হল, যেমন একজন মুজাহিদ শত্রুদের দূতাবাস থেকে ব্যবসায়ী ভিসা চাইল। যাতে এর মাধ্যমে তাদের দেশে ঢুকে তাদের উপর আঘাত হানতে পারে। তাই দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিকট ভিসার আবেদনের প্রকৃত কারণ ঢাকার জন্য তাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে ব্যবসার কথা প্রকাশ করল।

(ঘ) কা'ব ইবনে আশরাফ তাদেরকে দূর্গে প্রবেশ করিয়েছিল(“**অত:পর তাদেরকে দূর্গে ডাকল**”)। অর্থাৎ যেমন পাসপোর্ট কর্মকর্তারা ভিসার বাহককে বিমানবন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

(ঙ) সে তাদের থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করছিল। একারণেই তার স্ত্রী যখন আশঙ্কা প্রকাশ করল, তখন সে বলল: **এ তো আমার ভাই মুহাম্মদ**

১৫ ফাতহুল বারী লিইবনি হাজার- ৭/৪৬৩

ইবনে মাসলামা ও আমার দুধভাই আবু নায়িলা! মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা হলেন তার বোনের পুত্র। আর আবু নায়িলা হলেন তার দুধভাই।[১৬]

এটা ঐ সকল লোকদের কথার জবাব হয়ে যায়, যারা বলে, মুজাহিদদের জন্য ভিসা নিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করে আবার তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েয নেই। তারা তার কারণ বর্ণনা করে এই বলে যে, আমেরিকা যদি তাদের থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে না করত, তাহলে তাদেরকে প্রবেশ করতে দিত না।

(চ) তারা তাকে দূর্গ থেকে নিচে নেমে আসতে আহ্বান জানায়। অত:পর তার সাথে চলতে থাকে। তারপর একবার তার চুলের ঘ্রাণ নেওয়ার আবেদন করে, অত:পর আবারও একই আবেদন করে। এসবগুলোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যেন, সে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। এর উদাহরণ হল যেমন কোন মুজাহিদ আমেরিকায় যাচ্ছে তাদের টাওয়ার ধ্বংস করার জন্য। তাই তাদের নিকট বিমান চালনা শিখার জন্য ভিসার আবেদন করল এবং কার্যত বিমান চালনার প্রশিক্ষণ শুরু করে দিল। অথবা কেউ বলল, সে ভ্রমণের জন্য এসেছে। তারপর তার আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় তাদের সমুদ্র সৈকতে ও চিড়িয়াখানায় ভ্রমণ করতে লাগল।

এসবগুলোই এমন কাজকর্ম, যেগুলো দ্বারা নিরাপত্তা বা নিরাপত্তার কিছুটা সংশয় বুঝা যায়। আর এতে যুদ্ধকৌশল হিসাবে শত্রুদেরকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যাও বলা হয়েছিল। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করেছেন এবং যারা বিপরীত কথা বলে তাদের জবাব দিয়েছেন। আর অত্যন্ত পরিস্কারভাবে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, কা'বকে তখন আমান তথা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বা এধরণের

---

১৬ ফাতহুল বারী- ১১/৩৬৭

কোন ধারণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করার কারণে এগুলো কোন কাজে আসেনি। তাই শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“দলিলের দ্বিতীয় পদ্ধতি: যে পাঁচজন মুসলিম তাকে হত্যা করেছিল, তথা মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবু নায়িলা, আব্বাদ ইবনে বশীর, হারিস ইবনে আউস ও আবু আবস ইবনে জুবাইর- তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর আকস্মিক আক্রমণ করার এবং কথার মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে **কথার মধ্যে প্রকাশ করে যে, তারা তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে** এবং তার সাথে একমত হয়ে গেছে। অত:পর সুযোগ বুঝে হত্যা করে ফেলে।

আর এটা জানা আছে যে, **কেউ কোন কাফেরকে প্রকাশ্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে বা এমন ভাব প্রকাশ করলে, এরপর আর কুফরের কারণে ঐ কাফিরকে হত্যা করা জায়েয নেই। এমনকি যদি হারবী মুসলিম মনে করে যে, মুসলিম তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে এবং এ হিসাবেই তার সাথে কথা বলে, তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যা আমর ইবনে হামক বর্ণনা করেছেন: “যদি কেউ কোন লোককে নিজ রক্ত ও সম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে, আর এরপর উক্ত লোক তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এমন লোক থেকে আমি সম্পর্কমুক্ত। যদিও নিহত ব্যক্তি কাফের হোক না কেন।”[১৭]

সুলাইমান ইবনে সারদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেন:

---

১৭ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ।

“যখন কোন লোক তোমাকে নিজ রক্ত ও সম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে, তখন তুমি তাকে হত্যা করবে না।”[১৮]

হযতর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, “ঈমান হল বিশ্বাসঘাতকতার নিয়ন্ত্রণ। কোন মুমিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।”[১৯]

ইমাম খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ এর দাবি হল, তারা এই বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণ হল, সে আগে থেকেই নিরপত্তা চুক্তি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। তিনি আরো দাবি করেন যে, যে কাফেরের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি নেই, তার ক্ষেত্রে এমন করা বৈধ, যেমনিভাবে নৈশ আক্রমণ বা অতর্কীতে গুপ্ত আক্রমণ বৈধ।

কিন্তু এর জবাব দেওয়া হবে: সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এ ঘটনার সময় যে সব কথা বলেছেন, সেগুলোর দ্বারাই সে (আবারো) নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তার সর্বনিম্ন অবস্থা এই ছিল যে, তার মাঝে এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে সে নিরাপত্তা পেয়েছে। আর এমন ক্ষেত্রেও শুধু কুফুরীর কারণে হত্যা করা জয়েয নেই। কারণ নিরপত্তা চুক্তি হরবীর রক্তকে নিরপদ করে দেয়। এমনকি এর থেকে কম বস্তু দ্বারাও কেউ মুস্তামিন বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে। যা আপন স্থানে সকলেরেই জানাশোনা।

প্রকৃতপক্ষে এখানে তারা তাকে হত্যা করার কারণ হল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালমন্দ করত। **আর যার রক্ত এ কারণে হালাল হয়, তাকে কোন নিরাপত্তা বা যিম্মাচুক্তি নিরাপদ করতে পারে না। এটা হল এই অবস্থার অনুরূপ যে এমন ব্যক্তিকে কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে আমান তথা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল যাকে ডাকাতির কারণে বা আল্লাহ ও তার**

---

১৮ বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ।

১৯ বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ।

রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে হত্যা করা ওয়াজিব, অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল যাকে যিনার কারণে হত্যা করা ওয়াজিব, অথবা এমন ব্যক্তিকে কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, যাকে ইরতিদাদের কারণে অথবা ইসলামের কোন রুকন পরিত্যাগ করার কারণে হত্যা করা ওয়াজিব। এমন ব্যক্তির সাথে কোন ধরণের নিরাপত্তা চুক্তি করা জায়েয নেই। চাই নিরাপত্তা চুক্তি (আমান) হোক বা সন্ধিচুক্তি (হুদনাহ) হোক বা যিম্মাচুক্তি হোক। কারণ তাকে হত্যা করা 'হদ'র অন্তর্ভূত, তার হত্যা শুধু একারণে নয় যে, সে কাফের, হারবী। যেমনটা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আর গুপ্ত আক্রমণ ও নৈশ আক্রমণ করাতেও কোন সমস্যা নেই, কারণ এমন কোন কথা বা কাজ নেই যার দ্বারা তারা এ থেকে নিরাপদ হয়েছে বা মনে করেছে তারা নিরাপত্তা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে কা'ব ইবনে আশরাফের ঘটনাটি এর বিপরীত। **তার ব্যাপারে এটা প্রমাণিত যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালমন্দ করার মাধ্যমে কষ্ট দিয়েছে। আর এজাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে আমান থাকলেও রক্ত নিরাপদ হয় না।**"[২০]

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন:

"সকলের জানা আছে যে, রক্তের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবার ধারণাই প্রকৃত নিরাপত্তা হিসাবে ধর্তব্য। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দলটিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট পাঠিয়েছিলেন, তারা তার নিকট এসেছিল ঋণ চাওয়ার কথা বলে। তারা তার সাথে কথাবার্তা বলেছে। একসাথে চলেছে। **সে তাদের দিক থেকে নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করেছিল।** এছাড়া **ইতিপূর্বে তার মাঝে ও তাদের মাঝে নিরাপত্তা**

---

২০ আস সারিমুল মাসলুল- ২/১৭৯-১৮২

চুক্তি ছিল। তাই তার ধারণা ছিল, তা এখনো বহাল আছে। তারপর তারা তার মাথা থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে তার নিকট অনুমতি চায়। সে একবারের পর আরেকবার অনুমতি দেয়। এ সবগুলো জিনিসই নিরাপত্তা প্রমাণ করে। তাই যদি নবী সা.কে গালি না দিলে, শুধু কাফের হওয়ার কারণে তাকে আমান দেয়ার পর, এবং এমনটা প্রকাশ করা যে তারা তারা তার বিশ্বস্ত এবং তার কোন ক্ষতি করতে ইচ্ছুক না, এবং তারপর তাদের পক্ষ থেকে তার হাত ধরার অনুমতি চাওয়া...এসবের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা সাহাবিদের জন্য জায়েয হত না।

সুতরাং এর থেকে জানা গেল, **আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেওয়া হলে হত্যা করা আবশ্যক। কোন আমান বা চুক্তি এমন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারে না।**”[২১]

শায়খ নাসির আল-ফাহদ (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!) এর মতে যদিও ভিসা একটি নিরাপত্তাচুক্তি, কিন্তু তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন যে, এই নিরাপত্তা চুক্তি আমেরিকাকে মুসলিমদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে না এবং এ সমস্ত সংশয় দ্বারা ১১ ই সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলার উপর কোন আপত্তি আসবে না। আমি তার ফাতওয়ার বিবরণটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি:

সেপ্টেম্বর ১১ এর অভিযানগুলোর ব্যাপারে অবস্থান হল- সেগুলো সঠিক ও জায়েজ ছিল। **কারন অ্যামেরিকা হল বর্তমান সময়ে কুফরের মাথা, এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক গুরুতর পর্যায়ের অবমাননা করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রয়েছে ও তাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। অ্যামেরিকা সামষ্টিকভাবে একটি সত্ত্বা হিসেবে গণ্য হবে, কারন অ্যামেরিকার জনগণের সমর্থন ছাড়া প্রেসিডেন্ট, পেন্টাগন কিংবা আর্মি – কারোরই কোন একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নেই, সক্ষমতা নেই।**

---

২১ আস সারিমুল মাসলুল- ২/৫২২, ৩/৭৮৬ ও ৭৬৯, আহকামু আহলিজ জিম্মাতি লিইবনিল কাইয়িম- ৩/১৪৩৮-১৪৪১

যদি তারা (প্রেসিডেন্ট, পেন্টাগন কিংবা আর্মি) কোন পলিসির ক্ষেত্রে জনগণের খেয়ালখুশির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যায় তাহলে জনগন তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবে। আর এটি সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রের উপর সরকারের কোন মনোপলি বা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রন নেই। রাষ্ট্র জনগণের সামষ্টিক মালিকানার অধীন যেখানে তাদের প্রত্যেকের অংশীদারিত্ব আছে। যদি আপনি এ সত্য সম্পর্কে অবগত হন তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে **সামষ্টিকভাবে তারা সকলে (অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট, পেন্টাগন, আর্মি, জনগণ ইত্যাদি) আইনগতভাবে একটি অভিন্ন সত্ত্বা (a single juridical person) বলে পরিগণিত হবে। সামষ্টিকভাবে তাদের অবস্থা কা'ব ইবন আল-আশরাফ-এর অনুরূপ** যাকে হত্যা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহরীদ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কা'বকে বোকা বানিয়ে হত্যা করেছিলেন। তিনি **বাহ্যিকভাবে কা'বকে আমান (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, চুক্তি) দিয়েছিলেন,** কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার অপরাধে পরবর্তীতে তাকে হত্যা করেছিলেন। **কা'ব এর অপরাধ নিছক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকার চাইতে গুরুতর ছিল। কা'ব ইবন আল-আশরাফের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা কৌশল অবলম্বনের কারন ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা করা ও চরম সীমালঙ্ঘন। নিছক যুদ্ধরত হবার কারনে তার বিরুদ্ধে এ ধরণের কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়নি।**

আর **বর্তমানে অ্যামেরিকার অবস্থা কা'ব ইবন আল-আশরাফের মতোই। অ্যামেরিকা কেবলমাত্র যুদ্ধরত কাফির না, বরং সে হল এ যুগে কুফরের ইমাম, আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যার অবমাননা ও সীমালঙ্ঘন অত্যন্ত চরম মাত্রায় পৌছে গেছে।**

শায়খ আল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাব আস-সরিমুল মাসলুল 'আলা শাতিম আর-রাসূল এর খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯ এ বলেছেনঃ

"যে পাচজন মুসলিম তাকে (কা'ব) হত্যা করেছিলেন – মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা, আবু না'ইলাহ, আব্বাদ ইবন বিশর, আল-হারিস ইবন আওস এবং আবু আব্বাস ইবন জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম – রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন কা'ব ইবন আল-আশরাফকে হত্যা করার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের অনুমতি দিয়েছিলেন – এমন কথার মাধ্যমে কা'বকে ধোঁকা দেওয়ার যাতে করে সে মনে করে তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ও তারা (উক্ত পাচজন সাহাবী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার সাথে একমত – এবং তারপর তাকে হত্যা করার।

যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে প্রকাশ্যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (আমান) দেবে তার জন্য ঐ নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত কাফিরকে তার কুফরের জন্য হত্যা করা বৈধ না – একথা জ্ঞাত। বস্তুত যখন কোন যুদ্ধরত কাফির বিশ্বাস করে যে কোন মুসলিম তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং একথা তার কাছে ব্যক্ত করেছে, তখন সে একজন মুস্তা'মিনে (সাময়িক নিরাপত্তা প্রাপ্ত/রক্ষাপত্র) পরিণত হত।"

অতঃপর ইবনু তাইমিয়্যাহ মুস্তা'মিনকে হত্যার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দলিলাদি উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেনঃ

"আল-খাত্তাবি যুক্তি দেখিয়েছেন সাহাবীগণ রাঃ কা'বকে হত্যা করেছিলেন কারন কা'ব এ ঘটনার আগে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননার মাধ্যমে) এবং তাকে হত্যার সময় তার কোন নিরাপত্তার চুক্তি ছিল না। আল-খাত্তাবি আরো দাবি করেছেন চুক্তিবদ্ধ না

এমন কাফিরকে এভাবে হত্যা করা বৈধ, ঠিক যেমন রাত্রিকালীন হামলা কিংবা শত্রুর উপর অতর্কীতে হামলা করা বৈধ।

কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার দ্বারা কা'ব মুস্তা'মিনে পরিণত হয়েছে। নিদেনপক্ষে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার অনুরূপ আশ্বাস তাকে দেওয়া হয়েছিল; আর এধরনের নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তার কুফরের কারনে হত্যা করা জায়েজ না।

কারন আমান (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বা চুক্তি) শত্রুর জীবনের নিরাপত্তা দেয় আর এর (আমানের) চাইতে কমেও সে মুস্তা'মিনে পরিণত হয়, আর এ বিষয়গুলো সুবিদিত যেমনটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। **কিন্তু কা'বকে তার কুফরের কারনে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ এবং অবমাননার করা কারনেই হত্যা করা হয়েছিল। এমন সকল ব্যক্তি – যাদের রক্ত উক্ত কারনে হালাল হয়ে গেছে – কোন চুক্তি কিংবা আমানের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।** যদি কোন মুসলিম এমন কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কিংবা আমান দেয় যার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্য – যেমন একজন ডাকাত (highway robber), অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্যক্তি, অথবা এমন ব্যক্তি যে যমীনে এমন ফাসাদ ছড়ায় যার কারনে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়, অথবা যিনার কারনে যার উপর রযমের বিধান প্রযোজ্য হয়ে গেছে এমন ব্যক্তি, অথবা রিদ্দার কারনে যার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্য এমন ব্যক্তি, অথবা দ্বীনের কোন স্তম্ভ অস্বীকার করার কারনে যাকে হত্যা করা বৈধ এমন ব্যক্তি – তাহলে যেমন সেই আমান বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বৈধ না, এক্ষেত্রেই ব্যাপারটি অনুরূপ।"

ইবনুল ক্বাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ আহকাম আহলুয-যিম্মায় একই রকম মতব্যক্ত করেছেন। এখানে পয়েন্ট হল **যুদ্ধরত কাফিরদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেনী আছে যারা কা'ব ইবন আল-আশরাফের মতো।** এধরনের কাফিরদের আমান

বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েও ধোঁকা দেওয়া যাবে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কা'বের ক্ষেত্রে করেছেন, এবং যেমনটা মুজাহিদিন সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে করেছেন।

অনেকে মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের আশায় অনেক দূর এগিয়ে যায়। এগোতে গিয়ে হারিয়ে যায়। অনেকে বলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কা'ব ইবন আল-আশরাফের সামনে আপাতভাবে কুফর প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং এ থেকে বলা যেতে পারে যে এরকম ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বাহ্যিকভাবে কুফর প্রদর্শন করা জায়েজ। তারা আরো এগিয়ে এও বলেন যে, এ থেকে বলা যায় – "কা'বের হত্যাকারী সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কা'বকে যে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন তা আদতে (শার'ই) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বা আমান হিসেবে গণ্য হবে না কারন তারা তো নিজেদের কাফির হিসেবে উপস্থাপন করছিলেন"।

এ অবস্থান উসুলের দিক থেকে এবং প্রায়োগিক দিক থেকে বাতিল।

দুধরনের মানুষ এ বিষয়ে ভুল করে থাকেন।

একটি শ্রেণী হল যারা কাফিরকে দেওয়া মুসলিমের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে কোন গুরুত্বই দেন না। তারা মনে করেন জানমালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও একজন মুসলিম প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত কাফিরকে ধোঁকা দিতে পারে।

অপর শ্রেনী নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বা আমানের ক্ষেত্রে সব কাফিরকে একই পাল্লায় মাপেন। যারা কুফরের ইমাম এবং যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিকৃষ্ট ভাবে অবমাননা করেছে তারা তাদের অবস্থা সাধারন কাফিরদের সমতুল্য বা অনুরূপ মনে করেন।

আস সরিমুল মাসলুল 'আলা শাতিম আর-রাসূল কিতাবে শায়খ আল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ চুক্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে কাফিরদের বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা নিছক চুক্তি ভঙ্গকারী কাফির আর **যারা চুক্তিভঙ্গের পাশাপাশি মুসলিমদের অবমাননা করেছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যখনই মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন কাফির কর্তৃক মুসলিমদের অবমাননার খবর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছেছে, তিনি কাউকে না কাউকে সেই অবমাননাকারীকে হত্যার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। অথচ যারা শুধু চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদের অনেককে তিনি কেবল নির্বাসিত করেছেন, অথবা ক্ষমা করে দিয়েছেন।** একইভাবে সাহাবীগণও দামাস্কাসের কাফিরদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। কাফিররা চুক্তিভঙ্গ করায় তারা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও ঐ কাফিরদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল মিসরবাসীর সাথেও। কিন্তু যখনই সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আমানপ্রাপ্ত এমন কোন কাফিরকে পরাজিত করেছেন **যে ইসলামের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করেছে, কোন মুসলিম নারীর সাথে যিনা করেছে অথবা অনুরূপ কোন সীমালঙ্ঘন করেছেন, তারা তাকে হত্যা করেছেন। কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই এধরনের কাফিরদের হত্যা করার ব্যাপারটি বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছে। আর এটি সুবিদিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম সাধারন কাফির আর এধরনের কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন**।"[২২]

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেঃ কা'ব ইবন আল-আশরাফের ঘটনা হল এমন এক ব্যক্তির কথা যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি ছিল। যখন সে এই চুক্তি

২২ আস সরিমুল মাসলুল 'আলা শাতিম আর-রাসূল, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫২, ও খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৬৯, ৭৮৬। এবং আহকাম আহলুয যিম্মা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৩৮-১৪৪১

ভঙ্গ করলো (অবমাননা, ব্যাঙ্গোক্তি ও কুৎসার মাধ্যমে) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধোকা দিয়ে হত্যা করার জন্য কাউকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু আমরা বর্তমানে যাদের কথা বলছি এরা তো শুরু থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। যাদের সাথে মুসলিমদের কোন চুক্তিই নেই। তাহলে কী করে আপনি এমন কাফিরদের ধোঁকা দিয়ে তাঁদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাদের হত্যা করাকে জায়েজ মনে করেন?

এর জবাব হলঃ

ক) ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য কা'ব ইবন আল-আশরাফকে হত্যা করা হয় নি। **তাকে হত্যা করা হয়েছিল কারন সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য কাফিরদের উত্তেজিত করছিল, মুসলিমদের ব্যাপারে কুৎসা রটাচ্ছিল, মুসলিমদের নারীদের সম্মানহানি করছিল।**

খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাফিরদের ধোঁকা দিয়ে হত্যা করার জন্য সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম পাঠিয়েছিলেন যাদের সাথে তার কোন ধরনের চুক্তি ছিল না, কিন্তু **যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ও তাকে হত্যার জন্য অন্যান্যদের উদ্দীপ্ত করছিল**। এর উদাহরন হল আবু রাফে ইবন আবি আল হুক্বাইক এর ঘটনা, খালিদ ইবন সুফিয়ান আল-হুদ্বালির ঘটনা এবং ইহুদী ইয়াসির ইবন রাযযাম এর ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহুদী ইয়াসির ইবন রাযযামকে ফাঁদে ফেলে, ধোঁকা দিয়ে তাকে ও তার ৩০ জন সঙ্গীকে হত্যা করেছিল। খালিদ ইবন সুফিয়ান আল-হুদ্বালি আর ইহুদি ইয়াসির ইবন রাযযাম এর ঘটনা পরে আলোচিত হবে। আমি এখানে আবু রাফে'র ঘটনা উল্লেখ করছি।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফের উদ্দেশ্যে কয়েকজন আনসারী

সাহাবিকে প্রেরণ করলেন। তাদের নেতৃত্বভার দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর। আবু রাফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের **কুৎসা রটনা করত, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লোকদেরকে সাহায্য করত**। সে হিজাজে তার দূর্গে অবস্থান করত। তারা যখন দূর্গের নিকটবর্তী হল, তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। লোকজন নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় নিতে লাগল। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সাথীদেরকে বললেন: তোমরা আপন জায়গায়ই থাকবে। **আমি গিয়ে দারোয়ানকে বোকা বানানোর চেষ্টা করব, যাতে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি।**

তাই তিনি রওয়ানা দিলেন। দূর্গের ফটকের নিকটবর্তী হলেন। তারপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার ভাব দেখানোর জন্য কাপড় দ্বারা নিজ মাথা ঢেকে বসে পড়লেন। **সকল মানুষ ভিতরে প্রবেশ করে ফেললে দারোয়ান ঘোষণা দিল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রবেশ কর। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছি। তখন আমি প্রবেশ করে এক জায়গায় আত্মগোপন করলাম।** সকল লোক প্রবেশ করলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর চাবিগুলো একটি পেরেকের সাথে ঝুলিয়ে দিল। তিনি বলেন, তখন আমি চাবিগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলো নিলাম। তারপর দরজা খুলে ফেললাম।

আবু রাফের নিকট রাতের বেলা খোশগল্প হত। সে তার একটি উচ্চ কক্ষে অবস্থান করত। রাতের খোশগল্পকারীরা সকলে তার থেকে বিদায় নিলে আমি তার দিকে এগুলাম। আমি প্রত্যেকটি দরজা খোলার পরই ভিতর থেকে দরজাটি বন্ধ করে দিতাম। আমি চিন্তা করছিলাম, যেন লোকজন আমার ব্যাপারে জেনে গেলে আমি তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত কেউ আমার পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। আমি তার নিকট পৌঁছার পর দেখতে পেলাম, সে তার পরিবারের লোকজনের সাথে এক অন্ধকার কক্ষে অবস্থান করছে। আমি বুঝতে পারলাম না, সে কক্ষের কোন পাশে। তাই আমি ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে বলল: এই কে? তখন আমি আওয়াযের দিকে লক্ষ্য

করে এগিয়ে গিয়ে তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করলাম। আমি ছিলাম বেপরোয়া। তাই কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করলাম না। সে চিৎকার করে উঠল। আমি কক্ষ থেকে বের হয়ে অদূরেই এক জায়গায় অবস্থান করলাম। তারপর আবার প্রবেশ করে বললাম: এটা কিসের আওয়ায আবু রাফে?! সে বলল: রে হতভাগা!! কক্ষের ভেতরে এক ব্যক্তি প্রবেশ করেছে। সে একটু পূর্বে তরবারী দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে।

তিনি বলেন, তখন আমি তাকে আবার স্বজোরে আঘাত করলাম। আঘাত অত্যন্ত গভীর করলাম। কিন্তু তখনো পুরোপুরি হত্যা করে সারতে পারিনি। তখন আমি তরবরীর অগ্রভাগটি তার পেটের ভেতর গেঢ়ে দিয়ে পিঠ দিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যখন বুঝতে পারলাম যে, তাকে পুরোপুরি হত্যা করে ফেলেছি, তখন এক এক করে দরজা খুলতে লাগলাম। অবশেষে তার একটি সিড়ির নিকট আসার পর আমি নিচে চলে এসেছি মনে করে পা রাখলাম। তখন আমি পড়ে গেলাম। পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে গেল। আমি আমার পাগড়ী দিয়ে তার উপর ব্যন্ডেজ করলাম। তারপর চলতে চলতে দরজার উপর গিয়ে বসলাম। আমি মনে মনে বললাম, রাত শেষ হওয়ার পর সে নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বের হব না।

অবশেষে যখন মুরগি ডাক দিল এবং শোকবার্তা ঘোষণাকারী দেয়ালে উঠে ঘোষণা দিল: "আমি হেজাজের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফের শোকবার্তা ঘোষণা করছি।" তখন আমি আমার সাথীদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

তাদেরকে গিয়ে বললাম: সফল। আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। অত:পর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকিট গিয়ে পৌঁছে তার নিকট ঘটনার বর্ণনা দিলাম। তিনি বললেন: তোমার পা টি ছড়িয়ে দাও। আমি ছড়িয়ে দিলে তিনি তাতে হাত মুছে দিলেন। ফলে তা এমন সুস্থ হয়ে গেল, যেন আমি তাতে আঘাতই পাইনি কখনো।"[২৩]

---

২৩ সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদিস- ৩৭৩৩

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ এ হাদিস থেকে অর্জিত ফায়েদাসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেন:

<u>“আহলে হরবের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও গুপ্ত হামলার বৈধতা পাওয়া গেল।”</u>[২৪]

এখানে সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দারোয়নের সাথে কৌশল অবলম্বন করলেন, যেন দূর্গে প্রবেশ করতে পারেন। তাই এ ঘটনা থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করার শিক্ষাও অর্জিত হল। তা হল**<u>, মুসলিম তাদেরকে ধারণা দিবে যে, সে তাদের মধ্য থেকেই বা তাদেরই দেশী।</u>** এর উদাহরণ হল যেমন, কেউ এমন ধারণা সৃষ্টি করল যে, সে আমেরিকান বা ইংরেজ। অত:পর আমেরিকা বা বৃটেনে প্রবেশ করল তাদের উপর হামলা করার জন্য।

বর্তমানে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতে ব্যাপক সহজ পন্থা বিরাজ করছে। এমনকি অনেক সময় অনেক বিমান বন্দরে যাতায়াত সহজকরণে ঐক্যবদ্ধ দেশগুলোর অন্তর্ভূক্ত দেশের প্রজাদের জন্য ওই দেশের পাসপোর্টটি শুধু হাতে উপরে তুলে ধরলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই আবু রাফের ঘটনার উপর ভিত্তি করে একজন মুজাহিদের জন্য এমনটা করা জায়েয হবে।

(গ) আমেরিকা মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, তাদের দেশগুলো দখল করে নিয়েছে এবং ফিলিস্তীনে আফগানিস্তানে, ইরাকে, সোমালিয়ায় ও চেচনিয়ায় মুসলিম দেশগুলোর উপর আগ্রাসন চালানোর কাজে সহযোগীতা করছে, তাদের পেট্রোল চুরি করছে, তাদের নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা গালি দেয় তাদেরকে সম্মানিত করছে, ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে সর্বপ্রকার অবরোধ করেছে, তাদের উপর আক্রমণ পরিচালিত করেছে, ইরাকী

২৪ ফাতহুল বারী লিইবনি হাজার, কিতাবুল মাগাযি- ১১/৩৭১

জনগণের উপর অবরোধ আরোপ করেছে, তাদের উপর বোম্বিং করেছে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, তাই মুসলিমদের উপর তাদের পরিচালিত অত্যাচার প্রতিহত করা অবধারিত হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদানকারীদেরকে সম্মান করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

<u>(২) খালিদ ইবনে সুফিয়ান আলহুযালীর ঘটনা:</u>

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন: আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, খালিদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে নুবাইহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছে। সে এখন উরনায় আছে। তুমি তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে। তিনি বলেন, আমি বললাম: আমার জন্য তার দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যখন তাকে দেখবে, তোমার শরীরে একটি শিহরণ অনুভব করবে। তিনি বলেন: অত:পর আমি তরবারীতে সজ্জিত হয়ে বের হয়ে গেলাম। একেবারে তার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। সে উরানায় শিবিকারোহিনী নারীদের সঙ্গে ছিল। তাদের জন্য কোন অবস্থানের জায়গা খুজছিল। যখন আসরের সময় হল, তখন আমি তাকে দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছিলেন তেমন শিহরন অনুভব করলাম। আমি তার দিকে এগুলাম। আমার আশঙ্কা হল, তার মাঝে আর আমার মাঝে লড়াই চলাকালে নামাযের সময় চলে যেতে পারে। তাই আমি তার দিকে চলতে চলতেই মাথা দিয়ে ইশারায় রুকু, সেজদাহ করে নামায আদায় করে ফেললাম।

যখন তার নিকট পৌঁছলাম, সে বলল: এই লোক কে? আমি বললাম: **<u>আমি আরবের একজন লোক। তোমার কথা এবং তুমি যে এই লোকটিকে দমন</u>**

করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছ তা শুনতে পেয়ে তোমার নিকট আসলাম। বলল: হ্যাঁ, আমি এ লক্ষ্যেই যাচ্ছি। তিনি বলেন: **অত:পর আমি তার সাথে চলতে লাগলাম।** অবশেষে যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখন তরবারী দিয়ে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি বেরে হয়ে আসলাম। আর তার শিবিকারোহিনীরা তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তিনি আমাকে দেখেই বললেন: সে সফল হয়েছে। আমি বললাম: আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তুমি সত্য বলেছ।

অত:পর তিনি আমাকে সাথে নিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমাকে একটি লাঠি দিয়ে বললেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস! এটা তোমার নিকট রেখে দাও। তিনি বলেন: অত:পর আমি এটা নিয়ে লোকদের মাঝে বের হলাম। সকলে বলল: এই লাঠি কিসের? আমি বললাম: এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছেন এবং আমাকে আদেশ করেছেন এটা আমার কাছে রেখে দেওয়ার জন্য। তারা বলল: তুমি আবার ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তিনি বলেন: তখন আমি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেলাম। বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই লাঠিটি কেন দিলেন? বললেন: এটা কিয়ামতের দিন তোমার মাঝে আর আমার মাঝে নিদর্শন হবে। কিয়ামতের দিন লাঠি ভর দানকারী লোক সবচেয়ে কম থাকবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উনাইস রাযি. এটাকে তার তরবারীর সাথে যুক্ত করে নিলেন। অত:পর সর্বদা এটা তার সঙ্গে রাখতেন। এমনকি তার যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন তিনি আদেশ করেন, যেন

এটাকেও তার কাফনের সাথে দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কাফন ও লাঠি সহই তাকে দাফন করা হয়।[২৫]

আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনায় এসেছে:

তারপর **আমি কিছুক্ষণ তার সাথে চললাম।** এক সময় যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখন তরবারী দিয়ে আঘাত করতেই সে ঠান্ডা হয়ে গেল।

এই ঘটনায় সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রকাশ করলেন যে, তিনি একজন কাফের, আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। তিনি তার ইসলামকে গোপন করলেন। ফলে চলন্ত অবস্থায়ই ইশারা করে কিবলার দিক ব্যতিত ভিন্নদিকে নামায পড়লেন। তারপর খালিদ ইবনে সুফিয়ানের সাথে চলতে লাগলেন, তার সাথে কথাবার্তা বললেন। এভাবে তাকে নিশ্চিন্ত করলেন এবং তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন।

বর্তমানে এর উদাহরণ হল যেমন, একজন মুজাহিদ আমেরিকায় গেল আমেরিকানদের উপর আক্রমণ করার জন্য। আর তাদের দেশে প্রবেশের জন্য এই ধোঁকার আশ্রয় নিল যে, সে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছে। তারপর তার দাড়ি কেটে ফেলল এবং নামায গোপনে গোপনে আদায় করতে লাগল। যেন পূর্ণভাবে ধোঁকা দিতে পারে। সুতরাং যে তার উপর এই আপত্তি করবে যে, এমন মুজাহিদ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট সুন্নাহর মোকাবেলায় লিপ্ত হল।

---

২৫ মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৯৬, সুনানে আবু দাউদ- কিতাবুস সালাহ- ২/১৮, সুনানুল বাইহাকি আলকুবরা- ৯/৩৮, সহিহ ইবনু খুজাইমা- ২/৯১, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ- ৯/২৮-৩০, তারিখুত তাবারি- ২/২০৮

আবু বসীর রাযি. কর্তৃক তাকে গ্রেফতার করতে আসা দু'জনের একজনকে হত্যা করার ঘটনা:

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন:

"অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে গেলেন। তখন কুরাইশের জনৈক যুবক আবু বাসীর মুসলমান হয়ে তার নিকট আসল। কুরাইশরা তার খোজে দু'জন লোক পাঠাল। তারা বলল: আমাদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, তা রক্ষা করুন! তিনি তাকে লোক দু'টির হাতে সোপর্দ করে দিলেন। তারা তাকে নিয়ে বের হল। তারা যুলহুলায়ফায় পৌঁছলে সেখানে যাত্রাবিরতি করল তাদের সাথে থাকা খেজুর খাওয়ার জন্য। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দু'জনের একজনকে বললেন: হে অমুক! আল্লাহর শপথ! **আমি দেখছি, তোমার তরবারীটি খুবই ভাল।** তখন অপরজন সেটাকে কোষমুক্ত করে বলল: হ্যাঁ, এটা খুব ভাল তরবারী। আমি এটা অনেকবার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: **আমাকে একটু এটা দেখতে দাও!** সে তাকে দেখতে দিল। তখন আবু বাসীর রাযি. তাকে এক আঘাত করে ঠান্ডা করে দিলেন।

ফলে অপরজন পালিয়ে মদীনায় ফিরে আসল। দৌঁড়াতে দৌড়াতে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন: সে খুব ভয়ের কিছু দেখেছে! অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: আল্লাহর শপথ! আমার সাথীকে হত্যা করা হয়েছে! আমাকেও হত্যা করা হবে। অত:পর আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনার চুক্তি পুরা করেছেন। আপনি আমাকে তাদের কাছে যথাযথভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অত:পর আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দুর্ভাগ্য তাঁর মায়ের! এ তো যুদ্ধের ইন্ধন, যদি এর সাথে কেউ থাকত!

তিনি এটা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি (সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রোপকুলের দিকে চলে আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আবু জান্দাল ইবনে সুহাইলও তাদের থেকে পলায়ন করে এসে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মিলিত হলেন। তারপর থেকে কুরাইশের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে বের হলেই আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে এসে মিলিতি হত। ফলে তাদের একটি দল হয়ে গেল। তারপর আল্লাহর শপথ! কোন কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলার শামের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সংবাদ শুনলেই তারা তাদের পথ আটকাতেন। তাদেরকে হত্যা করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন। তাই কুরাইশরা আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নবী সা. এর নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে, যখনই বার্তাটি পৌঁছবে, তখন থেকেই যে-ই ইসলাম গ্রহণ করে তার নিকট আসবে সে ই নিরাপদ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদেকে ডেকে আনলেন।”[২৬]

এই ঘটনায় আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কৌশলের মাধ্যমে যে তাকে বন্দী করতে এসেছিল, তার তরবারীটি নিয়ে নিলেন। ফলে সে নিজেকে তার থেকে নিরাপদ মনে করল। ভাবল, সে শুধু তরবারীটি দেখবে। তিনি তাদেরকে হত্যা করার গোপন অভিসন্ধির কথা তাদেরকে জানালেন না। হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“আবু বাসীরের ঘটনা থেকে অনেকগুলো মাসআলা জানা যায়। তন্মধ্যে একটি হল, **সীমালঙ্ঘনকারী মুশরিককে আকস্মিক হত্যা করার বৈধতা।** আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যা করেছেন এটাকে গাদ্দারি হিসাবে ধরা হবে না। কারণ তিনি ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যকার চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কারণ তিনি তখন মক্কায় বন্দী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন্

২৬ সহিহ বুখারি- ৯/২৫৬

আশঙ্কা করলেন যে, মুশরিকরা তাকে পুনরায় শিরকে ফিরিয়ে নিবে, তখন তিনি তাকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজের আত্মরক্ষা করেন এবং এর মাধ্যমে নিজের দ্বীনও রক্ষা করেন। **আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই কাজের বিরোধিতা করেননি।**”[২৭]

এখানে দলিল এই দিক থেকে নয় যে, আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যকার চুক্তির ব্যাপারে গাদ্দারী করেননি। বরং এখানে দলিলের দিক হল: **গ্রেফতারকারীকে নিরাপত্তা দেওয়া বা নিরাপত্তার সংশয় সৃষ্টি করার পর হত্যা করা বৈধ।** কারণ সে তো জুলুমকারী। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এটাকে সমর্থন করেছেন। বরং একথা বলে এর প্রশংসা করেছেন- তাঁর মায়ের দুর্ভাগ্য! এটা তো যুদ্ধের ইন্ধন!! যদি তাকে নেতৃত্বে দেওয়ার মত কেউ থাকত।

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

((ويل امه))“তার মায়ের দুর্ভোগ”। (বাংলা ব্যবহার: তাঁর মায়ের দুর্ভাগ্য/রে হতভাগা!)

এটি একটি ভর্ৎসনার শব্দ। কিন্তু আরবরা এটা প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। এর অর্থের মধ্যে যে ভর্ৎসনা রয়েছে তারা সেটার উদ্দেশ্য করে না।[২৮]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ ‘আসসিয়ারুল কাবীর’ এ যা উল্লেখ করেছেন তাও এর মতই। মুসলিম বন্দী কাফেরদের হাতে থাকাবস্থায় যদি কাফেররা তার ব্যাপারে নিরাপত্তার ধারণায় থাকে, কিন্তু সে ধোঁকা দিয়ে তাদেরকে হত্যা করে পালিয়ে যায়, তার সম্পর্কে তিনি বলেন:

---

২৭ ফাতহুল বারী- ৮/২৮৩

২৮ ফাতহুল বারী লিইবনি হাজার- ৮/২৮৩

“যদি বন্দী তাদেরকে বলে, আমি চিকিৎসা বিদ্যায় খুব পারদর্শী। ফলে তারা তাদেরকে ঔষধ দেওয়ার আবেদন করল। তখন সে সকলকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে ফেলল। এক্ষেত্রে সে যদি শুধু পুরুষদেরকে বিষ পান করায়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ এটা তাদের উপর আঘাত হল। তবে তার জন্য নারী ও শিশুদেরকে বিষ পান করানো মাকরুহ হবে, যেমনিভাবে তাদেরকে হত্যা করাও হারাম ছিল। তবে যদি তাদের মধ্য থেকে কোন নারী তার ক্ষতি করে এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে, সেক্ষত্রে তাকেও বিষ পান করানো সমস্যা নয়, যেমনিভাবে সম্ভব হলে তাকে হত্যা করাও সমস্যা হত না।”[২৯]

(খ) মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রগুলো- উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা- সামস্টিকভাবে একটি অভিন্ন আইনী সত্তা হিসাবে ধর্তব্য।

আমেরিকান জনগণ সামস্টিকভাবে একটি সত্তা। আমেরিকা এবং অনেক পশ্চিমা রাষ্ট্রের জনগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মত ও সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তারা সকলেই এটা পছন্দ করে যে, শাসন, সিদ্ধান্ত বা আইন পাস হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের আলোকে। আর সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্টচিত্তে তার আনুগত্য করবে। এজন্যই উদাহরণত আমেরিকার প্রধান যা কিছু করে, সব সংখ্যাগরিষ্ঠের সন্তুষ্টি এবং সংখ্যালঘুদের এই সম্মতির মাধ্যমে করে যে, তাদের কার্যক্রমগুলো সাংবিধানিক ও সঠিক। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এটাকে সমর্থন করেছে। এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন, তাদের বিরোধী মতাবলম্বী সংখ্যালঘুদের উপর কর্তব্য হয়ে যায় এবং তাদের উপর শাসকের এই অধিকার হয়ে যায় যে, তারা তার আনুগত্য করবে এবং বশ্যতা স্বীকার করবে। এমনকি যদি কোন বিষয়ে তারা তার বিরোধী মত পোষণ করে, তথাপিও। এটা তাদের অবস্থার মাধ্যমে অনিবার্যভাবেই বুঝা যায়।

---

২৯ শরহু কিতাব আসসিয়ারুল কাবির- ২/৭ ও ৮

শায়খ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি রাহিমাহুল্লাহ ১১ সেপ্টেম্বরের ব্যাপারে প্রদত্ত তার ফাতওয়ায় বলেন:

قال الشيخ حمود العقلا رحمه الله في فتواه عن احداث الحادي عشر من ستمبر:

خاصة القرارات الحربية والمصيرية لا تقوم إلا عن "لابد ان نعرف ان اي قرار يصدر من الدولة الامريكية الكافرة طريق التصويت من قبل النوب في مجالسهم الكفرية والتي تمثل تلك المجالس طريق استطلاع الرأي العام أو عن القتال فهو محارب. الاولي رأي الشعب عن طريق وكلاءهم البرلمانين وعلي ذلك فإن اي امريكي صوت علي بالدرجة وعلي اقل تقدير فهو معين ومساعد"

“আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমেরিকান কুফরী রাষ্ট্রে যে আইনই পাস হয়, বিশেষ করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, তা তাদের কুফরী পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের ভোটের মাধ্যমেই হয়। আর যে অ্যামেরিকানই যুদ্ধের পক্ষে মত দিয়েছে সে মুহারিব বা হারবী হবে। কমপক্ষে সে তার সহযোগী ও সাহায্যকারী গণ্য হবে।”

এছাড়া আমেরিকান জনগণ ট্যাক্স দেয়, যার একটা অংশ আমাদের বিরুদ্ধে জুলুমের কাজে ব্যয় করা হয় এবং সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্যয় করা হয়।

তাই তারা একটি যুদ্ধরত, সীমালঙ্ঘনকারী ও প্রতিরোধকারী দল, যারা এক ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“তাই বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী ও তাদের সহযোগীগরাও তাদের দলভূক্ত। ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে তারা সমান সমান। এমনিভাবে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বিষয়ের উপর যারা পরস্পর যুদ্ধ করে তারাও উভয় পক্ষ সমান। যেমন

সাম্প্রদায়িকতা বা জাহেলী সম্বোধনের ভিত্তিতে যুদ্ধকারী। যেমন কায়েস ও ইয়ামান, যার উভয়টিই জালিম। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন দুই মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? বললেন: সেও তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল। হাদিসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে।

এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল জান-মাল যা কিছু ধ্বংস করে তার জিম্মাদার অপর দলও হবে। যদিও নির্দিষ্ট হত্যাকারীকে জানা না যায়। কেননা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকারী দল একটি ব্যক্তির ন্যায়।”[৩০]

আমরা ইতিপূর্বে শায়খ আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ এর এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেছিলাম: সকল মুসলিমদের উপর আবশ্যক, ইংরেজ, ফ্রান্স ও তাদের মিত্রদেরকে যেখানেই পাওয়া যায়, তাদের উপর আক্রমণ করা।

যেমন শায়খ নাসির আল-ফাহদ (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!) ভিসা সম্পর্কে তার প্রদত্ত ফাতওয়ায় এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, সমগ্র আমেরিকা সামস্টিকভাবে একটি অভিন্ন সত্তা, যেটা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

কিছুক্ষণ পূর্বেই উল্লেখিত ফাতয়ায় শায়খ হামুদ আল-উকলা রাহিমাহুল্লাহ এটাও বলেন: “এ বিষয়টা নিশ্চিত হওয়ার পর আপনি জেনে রাখুন যে, আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতাকারী একটি কাফের রাষ্ট্র। এ যাবত অনেক মুসলিম দেশের উপর তাদের আক্রমণ পৌঁছে গেছে।”

শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ তাদেরকে বুশের কার্যক্রম থেকে সম্পর্কমুক্ত হতে এবং তার জুলুমের সহযোগী না হওয়ার প্রতি আহ্বান করেছেন। কিন্তু তারা

---

৩০ দাকায়েকুত তাফসীর- ২/৩৬, মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৮/৩১২

তাতে সাড়া দেয়নি। বরং শায়খ রাহিমাহুল্লাহ এও বলেছেন যে, যে সকল প্রজতন্ত্রগুলো আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকবে, তাদের ব্যাপারে ভিন্ন মুআমালা হবে। কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি। তাহলে এর থেকে আর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে?

মুসলমানদের উপর সীমালঙ্ঘনকারীদের মিত্ররা যদি তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তারাও শাস্তির ক্ষেত্রে তাদের অংশীদার হবে। তাহলে যারা সীমালঙ্ঘনে তাদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করে, তাদের কি হতে পারে?!!

এমনকি আমরা যদি মেনেও নেই যে, ভিসা হল ভিসা প্রদানকারী দেশের জনগনের জন্য একটি নিরাপত্তা চুক্তি, তথাপি আমেরিকা ও তাদের মিত্র দেশগুলোর জনগণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। কারণ তাদের কিছু অংশ তো সরাসরি সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়েছে আর কিছু অংশ তাদের কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, কিছু তার বৈধতার ব্যাপারে বিরোধিতা না করে, উল্টো এটাকে একটি সাংবিধানিক কাজ হিসাবে গণ্য করেছে। কারণ অধিকাংশ জনগণ এর উপর ঐক্যমত্য পোষণ **করেছে। এমনিভাবে আমেরিকান যুদ্ধে তাদের মিত্রদের চুক্তিও ভঙ্গ হয়ে গেছে। যেমন ন্যাটো জোট।** যারা আমেরিকান অপরাধযজ্ঞের ব্যাপারে শুধু সন্তুষ্টই নয়, বরং তারা তাদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণও করেছে এবং আফগানিস্তানে, ইরাকে, ফিলিস্তীনে ও সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সর্বাগ্রে ছিল।

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

"রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল, তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করতেন, অত:পর তাদের কিছু অংশ সন্ধি ভঙ্গ করত আর বাকিরা সন্ধির উপর বহাল থাকলেও তার সীমালঙ্ঘনের উপর সন্তুষ্ট থাকত, **তখন তিনি তাদের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন। সকলকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য করতেন।** যেমনটা তিনি বনু কুরাইযা, বনু

নাযির ও বনু কাইনুকার সাথে করেছেন এবং যেমনটা মক্কাবাসীদের সাথে করেছেন। তাই এটা হল সন্ধির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।"[৩১]

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো সুন্নাহ ও নীতি ছিল যে, তিনি যখন কোন কওমের সাথে সন্ধি করতেন, অত:পর তাদের সঙ্গে তার অন্য কোন শত্রুদলও এসে মিলিত হত এবং তাদের সঙ্গে সন্ধির আওতাভূক্ত হত অথবা কোন সম্প্রদায় তার সঙ্গে এসে মিলিত হত এবং তার সঙ্গে সন্ধির আওতাভূক্ত হত, তখন তার সাথে সন্ধিভূক্ত কারো সঙ্গে কোন শত্রুদল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তিনি মনে করতেন, যেন তারা তার সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। একারণেই তিনি মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কারণ তিনি যখন তার মাঝে ও কুরাইশদের মাঝে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করেছিলেন, তখন বনু বকর ইবনে ওয়ায়িল গোত্র দৌঁড়ে এসে কুরাইশের সন্ধির সাথে যুক্ত হয় আর বনু খুজাআ গোত্র দৌঁড়ে এসে মিলিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধির সাথে। তারপর বনু বকর বনু খুজাআর উপর সীমালঙ্ঘন করে, রাতের বেলা তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের অনেক সদস্যকে হত্যা করে আর কুরাইশরা গোপনে গোপনে অস্ত্র দিয়ে এতে সাহায্য করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **এর কারণে কুরাইশকেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত করেন আর বনু বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও বৈধ করেন, যেহেতু তারা তার মিত্রদের উপর আক্রমণ করেছে।** সামনে ঘটনার বিবরণ আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ পাশ্চাত্যের নাসারাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই ফাতওয়াই দিয়েছিলেন, যখন তারা মুসলিমদের শত্রুদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল এবং সম্পদ ও অস্ত্রের মাধ্যমে মদদ যুগিয়েছিল। যদিও তারা

---

৩১ যাদুল মাআদ- ৩/১৩৬

আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, সরাসরি লড়াই করেনি। কিন্তু এর কারণেই তাদেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বলে মত দিয়েছেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরাইশরা বনু বকর ইবনে ওয়ায়িলকে তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হয়েছিল।"[৩২]

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ফতহে মক্কার ঘটনা থেকে অর্জিত মাসআলাসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করেন:

"পরিচ্ছেদ:

এর থেকে এ মাসআলা পাওয়া যায় যে, চুক্তিবদ্ধ কাফেররা যখন এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা ইমামের যিম্মায় বা আশ্রয়ে আছে, তাহলে এর দ্বারা তারা হারবী হয়ে যাবে। তাদের মাঝে আর তার মাঝে কোন চুক্তি বাকি থাকবে না। **তার জন্য জায়েয হবে তাদের দেশের উপর রাত্রিবেলা আক্রমণ করা। তাদেরকে সরাসরি ঘোষণার মাধ্যমে জানানোর প্রয়োজন হবে না।** সরাসরি ঘোষণা দিতে হয়, যখন তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করে। পক্ষান্তরে যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেই ফেলে, তখন তো এর দ্বারা তারাই প্রকাশ্যে চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে দিল।

পরিচ্ছেদ:

এর থেকে এ মাসআলাও অর্জিত হল যে, এর দ্বারা সাহায্যকারী এবং সরাসরি অংশগ্রহণকারী সকলের চুক্তিই ভঙ্গ হয়ে যায়, যখন সকলেই এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, এটাকে সমর্থন করে এবং এর প্রতিবাদ না করে। কারণ কুরাইশের মধ্য থেকে যারা বনু বকরকে সাহায্য করেছিল, তারা ছিল তাদের কিছু অংশ। তাদের সকলে বনু বকরের সাথে মিলে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

৩২ যাদুল মাআদ- ৩/১৩৮

করেছেন। এর কারণ হল, তারা যেমনিভাবে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক চুক্তি না করা সত্ত্বেও গোত্রের সদস্য হিসাবে সকলে চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যেহেতু তারা এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, এর বিরোধিতা করেনি, তেমনিভাবে চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রেও সকলেই অংশীদার হবে।

এটা হল রাসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ। যার মধ্যে কোন সন্দেহে নেই।"[৩৩]

দেখুন, ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ কি মজবুত কারণ উল্লেখ করেছেন! তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **চুক্তি হয় কোন সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীলের সাথে। এটাই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যের সাথে চুক্তি। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চুক্তির প্রয়োজন নেই। দায়িত্বশীলের চুক্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই নিরাপত্তার আওতাভূক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যখন সম্প্রদায়ের নেতা চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের প্রত্যেকেই চুক্তিভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। প্রত্যেকের পৃথক চুক্তিভঙ্গ আবশ্যক নয়।**

তার একথাটি লক্ষ্য করুন, "তা**র জন্য জায়েয হবে তাদের উপর রাত্রি বেলা আক্রমণ করে দেওয়া**। তাদেরকে সরাসরি ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে না। সরাসরি ঘোষণা দিতে হয়, যখন তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করে।"

অর্থাৎ যখন চুক্তিবদ্ধ কাফেররা তাদের উপর আক্রমণ করে দেয় এবং চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের জন্য কোন ঘোষণা না দিয়ে **আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েয হবে**। কারণ প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সূচনা হয়েছে তাদের থেকে। তাদেরকে সরাসরি ঘোষণা দিতে হবে, যখন তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা আশঙ্কা হবে।

যদি বলা হয় যে, কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাসে তো এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তাদের মাঝে আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ চলত, কিন্তু তা সত্ত্বেও

---

৩৩ যাদুল মাআদ- ৩/৩৭০

যখন কোন কাফের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করত অথবা কোন মুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে প্রবেশ করত, তখন রক্ত হেফাজতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাচুক্তি কার্যকর হত।

উত্তর হল, যা শায়খ নাসির আলফাহ্দ (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন!) ভিসা সম্পর্কে তার প্রদত্ত ফাতওয়ায় উল্লেখ করেছেন, যা আমি একটু পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেখানে তিনি বলেছেন:

"যদি আপনি এ সত্য সম্পর্কে অবগত হন তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সামষ্টিকভাবে তারা সকলে (অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট, পেন্টাগন, আর্মি, জনগণ ইত্যাদি) আইনগতভাবে একটি অভিন্ন সত্ত্বা (a single juridical person) বলে পরিগণিত হবে। সামষ্টিকভাবে তাদের অবস্থা কা'ব ইবন আল-আশরাফ-এর অনুরূপ যাকে হত্যা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহরীদ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কা'বকে বোকা বানিয়ে হত্যা করেছিলেন। তিনি বাহ্যিকভাবে কা'বকে আমান (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, চুক্তি) দিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার অপরাধে পরবর্তীতে তাকে হত্যা করেছিলেন। কা'ব এর অপরাধ নিছক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকার চাইতে গুরুতর ছিল। কা'ব ইবন আল-আশরাফের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা কৌশল অবলম্বনের কারন ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা করা ও চরম সীমালঙ্ঘন। নিছক যুদ্ধরত হবার কারনে তার বিরুদ্ধে এ ধরণের কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়নি।

আর বর্তমানে অ্যামেরিকার অবস্থা কা'ব ইবন আল-আশরাফের মতোই। অ্যামেরিকা কেবলমাত্র যুদ্ধরত কাফির না, বরং সে হল এ যুগে কুফরের ইমাম, আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যার অবমাননা ও সীমালঙ্ঘন অত্যন্ত চরম মাত্রায় পৌছে গেছে।.........................

মোটকথা, এখানকার সারকথা হল **যুদ্ধরত কাফিরদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেনী আছে যারা কা'ব ইবন আল-আশরাফের মতো।** এধরনের কাফিরদের আমান বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েও ধোঁকা দেওয়া যাবে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কা'বের ক্ষেত্রে করেছেন, এবং যেমনটা মুজাহিদিন সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে করেছেন।"

যদি বলা হয় যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একজনকে হত্যা করেছেন, সেখানে আপনারা কিভাবে তার দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে দলিল দেন?

তাহলে উত্তর দিব:

(ক) কোন পার্থক্য নেই। কারণ আমরা বলেছি যে, আমেরিকা সামস্টিকভাবে একটি আইনী সত্তা।

(খ) অত:পর আমরা ধরি যে, মুজাহিদগণ বুশকে হত্যা করার জন্য একটি টিম পাঠালেন। যেহেতু সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মানুষকে জমায়েত করছে। তাই তারা তার কাছে গেলেন নিরাপত্তা নিয়ে বা নিরাপত্তার একটি সংশয় সৃষ্টি করে। যেমনটা মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও তার সাথীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) করেছেন। এরপর আমরা ধরি যে, আরেকটি টিমকে পাঠালেন ডিক চেনিকে হত্যা করার জন্য। আর তৃতীয় আরেকটি টিমকে পাঠালেন রামসফেল্ডকে হত্যা করার জন্য। আর হুবহু এটাই কি আমাদের মাসআলা নয়?

আমরা আরো মনে করি যে, তারা চতুর্থ একটি টিম পাঠিয়েছেন সেই নাটক নির্মাতাকে হত্যা করার জন্য, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে।

আরো ধরুন যে, তারা একশ'টি বাহিনী পাঠিয়েছেন কুফরের বিভিন্ন লিডারদেরকে হত্যা করার জন্য। অত:পর তারা হুবহু মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. এর কর্মপন্থাই অবলম্বন করল। তাহলে আমাদের মাসআলাটি কি হুবহু এটাই নয়?

অথবা ধরুন যে, তারা একটি টিমকে পাঠিয়েছে এ সবগুলো লক্ষ্য পুরা করার জন্য। অত:পর তারা তা কার্যকর করল। তাহলে হুবহু এটাই কি আমাদের মাসআলা নয়?

আরো ধরুন যে, তারা কুফরের এ সকল লিডারদেরকে হত্যা করার প্রচেষ্টার মধ্যে তাদের কতগুলো সহযোগীকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে বা এমন কতককে হত্যা করে ফেলেছে, যাদেরকে পৃথকভাবে উদ্দেশ্য করে হত্যা করা জায়েয নেই, তবে অন্যদের মাঝে নিহত হয়ে গেলে সমস্যা নেই, তাহলে এটা কি জায়েয হত না?

যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মধ্যে কি এমনটা আছে যে, তিনি এমন কাউকে পাঠিয়েছেন, যে মক্কায় বা পারস্যে বা রোমে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করার পর আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করে দিয়েছে বা তাদের সম্পদ ছিনতাই করে নিয়েছে?

উত্তরে বলব: প্রথমত আমরা মানিই না যে, ভিসা একটি নিরাপত্তা চুক্তি।

দ্বিতীয়ত: তিনি কা'ব ইবনে আশরাফ, রাফে ইবনে আবিল হুকাইক, ইয়াসির ইবনে রাযাম ও সুফিয়ান ইবনে খালিদ আল-হুযালীকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাহিনী প্রেরণ করেছেন, যারা ধোঁকার মাধ্যমে তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করেছেন।

যদি বলা হয় যে, কিন্তু যে সকল মুজাহিদগণ আমেরিকায় প্রবেশ করেছে তারা তো নিরাপত্তাচুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে আগে তাদেরকে অবগত করেনি?

তাহলে উত্তর হল, বিশ্বাসঘাতকতাকারী রাষ্ট্রকে সতর্ক করা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ আছে। আর একথা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন আমরা মেনে নিব যে, ভিসা একটি নিরাপত্তা। কিন্তু আমরা এটা আদৌ মানি না।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যখন কোন মুসলিম সম্প্রদায় নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তখন শত্রুরাও তাদের থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, যতক্ষণ না তারা তাদের দেশ ত্যাগ করে বা তাদের নিরাপত্তাচুক্তির মেয়াদ পূরণ করে ফেলে। তাদের জন্য তাদের উপর আক্রমণ করা বা খেয়ানত করা জায়েয নেই।

যদি শত্রুরা মুসলিমদের নারী ও শিশুদেরকেও বন্দী করে, তবু আমি তাদের জন্য শত্রুদের সাথে গাদ্দারী করা পছন্দ করি না। বরং আমি পছন্দ করি, তারা তাদের নিকট নিরাপত্তা চুক্তি শেষ করে দেওয়ার কথা বলবে এবং তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করবে। এটা করার পর নারী ও শিশুদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে।"[৩৪]

তিনি আরো বলেন: "যখন মুসলমানদের কোন দল নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে, অত:পর হারবীরা একদল মুসলিমকে বন্দি করে, তখনও মুস্তামিনদের জন্য তাদের চুক্তি প্রকাশ্যে অকার্যকর করার আগ পর্যন্ত হারবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। যখন তাদের চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের প্রতি ছুড়ে দিবে, অত:পর তাদেরকে সতর্ক করবে এবং উভয় দলের মাঝে নিরাপত্তা চুক্তি শেষ হয়ে যাবে, তখনই তাদের জন্য যুদ্ধ করা জায়েয হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না।"[৩৫]

---

৩৪ আল উম্ম- আলমুস্তা'মান ফি দারিল হারব- ৪/২৬৩

৩৫ আলউম্ম- ৪/২৯৩

পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ও হানাফীগণ কেউ প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা করলে তাদেরকে প্রকাশ্যে চুক্তি শেষ হওয়ার কথা জানানোকে শর্ত করেন না।

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“পরিচ্ছেদ:

এর থেকে এ মাসআলা পাওয়া যায় যে, চুক্তিবদ্ধ কাফেররা যখন এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা ইমামের যিম্মায় বা আশ্রয়ে আছে, তাহলে এর দ্বারা তারা হারবী হয়ে যাবে। তাদের মাঝে আর তার মাঝে কোন চুক্তি বাকি থাকবে না। তার জন্য জায়েয আছে তাদের দেশের উপর রাত্রিবেলা আক্রমণ করা। তাদেরকে সরাসরি ঘোষণার মাধ্যমে জানানোর প্রয়োজন হবে না। সরাসরি ঘোষণা দিতে হয়, যখন তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করে। পক্ষান্তরে যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেই ফেলে, তখন তো এর দ্বারা তারাই প্রকাশ্যে চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে দিল।”[৩৬]

ইবনুল হুমাম আলহানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“যে হরবীদের মাঝে নিরাপত্তা গ্রহণকারী মুসলিমগণ বিদ্যমান, তারা যদি কোন মুসলিম দলের উপর আক্রমণ করে, তাদের নারী-শিশুদের বন্দী করে, অত:পর তাদেরকে নিয়ে ঐ সকল মুস্তামিন মুসলিমদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সামর্থ্য হলে তাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে, তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কারণ ঐ সকল কাফেররা তাদের মনিব নয়। তাই তাদের হাতে তাদেরকে রেখে দেওয়া মানে জুলুমকে সমর্থন করা। আর তারা তাদের ব্যাপারে এই যিম্মাদারি গ্রহণ করেনি। কিন্তু সম্পদের বিষয়টা এর থেকে ভিন্ন। কারণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার দ্বারা তারা

---

৩৬ যাদুল মাআদ- ৩/৩৭০

সেটার মালিক হয়ে গেছে। তারা তাদেরকে এই গ্যারান্টি দিয়েছে যে, তারা তাদের সম্পদের উপর আক্রমণ করবে না। এমনিভাবে যদি ধৃতরা খারিজীদের নারী-শিশু হয়, তবুও একই বিধান। কারণ তারাও মুসলমান।”[৩৭]

শুধু তাই নয়, **হানাফিগণ মনে করেন, যে সকল কাফেরদের নিকট একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাদেরকে পুনরায় দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব।** তবে যদি দাওয়াত দিলে মুসলমানদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা পরিত্যাগ করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহিমাহুল্লাহ মনে করেন, এমতাবস্থায় দাওয়াত পরিত্যাগ করা শুধু মুস্তাহাব দাওয়াতের ক্ষেত্রেই সিদ্ধ নয়, বরং ফরজ দাওয়াতের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাই তিনি তার হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিনে বলেন:

“(আর যার নিকট দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাকে আমরা দাওয়াত দিব মুস্তাহাব হিসাবে। তবে যদি এতে কোন ক্ষতি থাকে, তবে ভিন্নকথা।) “যদিও ক্ষতির আশঙ্কা তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয়। যেমন তারা প্রস্তুত হয়ে যাবে বা দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তখন দাওয়াত দিবে না।”

তার বক্তব্য “তবে যদি এতে কোন ক্ষতি থাকে..”, ফকীহগণ এই (ইস্তেসনা) ব্যতিক্রম অবস্থা শুধু মুস্তাহাব দাওয়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটা ওয়াজিব দাওয়াতের ক্ষেত্রেও হতে পারে।”[৩৮]

আর কোন সন্দেহ নেই যে, আমেরিকানদের নিকট ইসলামের দাওয়াতে পৌঁছে গেছে। আমি এর সাথে আরো যোগ করে বলছি যে, মুজাহিদগণ আমেরিকানদেরকে বহুবার সতর্ক করেছেন।

---

৩৭ ফাতহুল কাদির- বাবুল মুস্তা’মিন, ১৩/৯৭, আলমাবসুত- ১২/২১৫, দুরারুল হুক্কাম- ৩/ ৩৭৩, আলবাহরুর রায়েক- ৩/৩৭৩

৩৮ রদ্দুল মুহতার আলা আদদুররুল মুখতার- হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন- ৩/২২৩

ওয়াসিকার লেখক তার মত “নিউয়র্ক হামলার ঘটনাটি গাদ্দারির অন্তর্ভূক্ত” এর ভিত্তি রেখেছেন কতগুলো দলিলের উপর, যেগুলো তিনি ওয়াসিকার মধ্যে এবং ‘আলজামে’ নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা নিম্নে তুলে ধরছি:

(১) নিরাপত্তার মূলকথা হল রক্ত ও সম্পদ সুসংরক্ষিত হওয়া। কেউ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করলে তারা তার রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়। তাই ভিসাকে একটি নিরাপত্তা চুক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে, যদিও ভিসার মধ্যে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কারণ এরূপ প্রচলনই চলে আসছে। আর “যা প্রথাগতভাবে প্রচলিত, তা স্পষ্টভাবে শর্তকৃত বস্তুর মতই” এমনিভাবে “চিরাচরিত নিয়ম হুকুম সাব্যস্তকারী।”

এই দলিলের উত্তর নিম্নে দেওয়া হল:

(ক) যেটা আমি একটু পূর্বেই উল্লেখ করলাম যে, পাশ্চাত্যে ভিসা বহনকারী ব্যক্তি নিজের দ্বীন, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে নিরাপদ নয়।

(খ) আর ফিকহি মূলনীতি-“যা প্রথাগতভাবে প্রচলিত, তা স্পষ্টভাবে শর্তকৃত বস্তুর মতই” এমনিভাবে “চিরাচরিত নিয়ম হুকুম সাব্যস্তকারী”-এর মাধ্যমে দলিল দেওয়ার ব্যাপারে আমি বলব:

(১) আমি ওয়াসিকার নীতির উপর কয়েকটি আপত্তির মধ্যে বলেছি যে, **লেখক শুধু সাধারণ ও ব্যাপক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি তার বিশ্লেষণ উল্লেখ করেন না**। সেটা ছিল ওয়াসিকার নীতির ব্যাপারে আমার এগারতম আপত্তি।

(২) ফুকাহায়ে কেরাম 'উরফ' ও 'আদাত'(প্রচলন ও চিরাচরিত নিয়ম) এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন। এই মাসআলা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু আমি এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করব যে, **ফুকাহায়ে কেরাম ঐ সময় উরফ ও আদতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না, যখন উরফ ও আদত শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।**[৩৯]

ভিসার মাসআলায় উরফ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার উদাহরণ হল:

(১) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত, তাদের উপর আক্রমকারী এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদানাকরী রাষ্ট্রগুলোর ভিসাকে মুসলমানদের জন্য তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যবহার করা। আমি এটা ইতিপূর্বেও স্পষ্ট করেছি এবং বলেছি যে, একথাটি সহীহ সুন্নাহর পরিপূর্ণ বিরোধী।

(খ) কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মাসআলা। এটা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি মাসআলা। আন্তর্জাতিক চুক্তিও এটাকে আরো সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু এটা শরীয়ত বিরোধী। দারুল ইসলামে শরীয়ত কার্যকর হওয়া থেকে সুরক্ষিত কেউ নেই।[৪০]

(২) ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য-এক পক্ষের নিরাপত্তা অপর পক্ষের নিরপত্তাকে আবশ্যক করে।

এর উত্তর হল: ক) আমরা এটা মানি না যে, ভিসা একটি নিরাপত্তা চুক্তি। লেখকের উপর আবশ্যক হল এটা প্রমাণ করা। আর নিরাপত্তার মূলকথা হল রক্ত ও সম্পদ সুসংরক্ষিত হওয়া-বলে লেখক যে দলিল পেশ করেছেন, আমি তার জবাব দিয়েছি।

---

৩৯ আলআশবাহ ওয়াননাজায়ের- ১/১৬৪-১৮৪

৪০ আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ- ৮/৫৯৭০-৫৯৭৬, ৬৪২৪-৬৪২৭

(খ) আমি সুস্পষ্টরূপে বলেছি যে, এ মাসআলার ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

(গ) আমি এটাও স্পষ্ট করেছি যে, যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটায়, মুসলমানদের উপর সীমালঙ্ঘন করে, মুসলমানদের নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি দেয়, তাকে নিরাপত্তাচুক্তি রক্ষা করতে পারবে না।

(৩) লেখক তার কিতাব 'আলজামে' এ দাবি করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ হারবীদের চিঠির মিথ্যা কপিকে নিরাপত্তা হিসাবে গণ্য করেছেন। অত:পর লেখক তার উপর মিথ্যা ভিসাকে কিয়াস করেছেন। অত:পর একই বিষয়কে তার ওয়াসিকায় একাধিকবার উল্লেখ করেন।

তার এ দাবিটি ভুল।

(ক) মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ হারবীদের চিঠির মিথ্যা কপি সম্পর্কে কথা বলেননি। তার কথা ছিল এমন লোকদের ব্যাপারে, যারা দাবি করে যে, তারা খলীফার দূত এবং তারা এ ব্যাপারে একটি পত্রও দেখায়। এটা হরবীদের চিঠি নকল করা বা মিথ্যা ভিসা বানানো থেকে ভিন্ন জিনিস। একারণে লেখকের জন্য ওখানে শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ এর কথার উপর মিথ্যা ভিসাকে কিয়াস করার কোন ভিত্তি ছিল না।

আর শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ এর কথার উপর চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, তিনি কথা বলেছেন ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে, যারা দাবি করে যে, তারা খলীফার দূত। আর এটা সাধারণভাবে প্রচলিত যে, দূত ও বার্তাবাহকদেরকে হত্যা করা হয় না। বরং এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সুন্নাহ।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসুদ রাযি. বলেন: ইবনে নাওয়াহা ও উসাল মুসাইলার

দূত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের নিকট আসল। রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে জিজ্ঞেষ করলেন: তোমরা কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল? তারা বলল: আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি যদি দূতদেরকে হত্যা করতাম, তবে তোমাদেরকে হত্যা করতাম। বর্ণনাকারী বলেন: তখন থেকে এই নীতি জারি হয় যে, দূতদেরকে হত্যা করা যায় না।[৪১]

একই পরিচ্ছেদে শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ অন্য আরেক শ্রেণীর লোকের ব্যাপারে কথা বলেন, যাদের জন্য অন্য কিছু কৌশলের মাধ্যমে হারবীদেরকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ ছিনতাই করা বৈধ। যেহেতু সেগুলোর ব্যাপারে সাধারণ প্রচলন জারি আছে।

শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

"মুসলমানদের কোন একটি দল হারবীদের কোন স্বশস্ত্র দলের নিকট এসে বলে, আমরা খলীফার দূত। অত:পর তারা এমন কোন পত্র বের করে, যেটা খলীফার পত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন বা তা বের করল না। আর এটা ছিল তাদের পক্ষ থেকে মুশরিকদের প্রতি ধোঁকা।

তখন তারা বলল: ঠিক আছে, তোমরা প্রবেশ কর।

ফলে তারা দারুল হরবে প্রবেশ করে।

তখন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দারুল হরবে অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য কোন হারবীকে হত্যা করা বা তাদের কোন সম্পদ ছিনতাই করা জায়েয হবে না।"[৪২]

অত:পর তিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

---

৪১ মুসনাদে আহমাদ- হাদিস- ৩৭৩৫, ৮/১০৮

৪২ আসসিয়ারুল কাবির- ২/৫০৭

“এমনিভাবে তারা যদি বলে, আমরা ব্যবসার জন্য এসেছি।

অথচ তাদের উদ্দেশ্য হল, আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করা। তবুও তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েয হবে না।

কারণ তারা যেমনটা প্রকাশ করেছে, যদি প্রকৃতই তেমন, অর্থাৎ ব্যবসায়ী হত, তাহলে তাদের জন্য হারবীদের সাথে গাদ্দারী করা জায়েয হত না। তাই যখন এটা প্রকাশ করেছে, তখনও জায়েয হবে না।”[৪৩]

এর কারণ হল, যেহেতু সে যামানায় সাধারণ নীতি ছিল যে, ব্যবসায়ী ও দূতদের উপর আক্রমণ করা হয় না, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যখন হারবী আমান ব্যতিত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, তখন দেখা হবে যে, তার সাথে দারুল ইসলামে বেচা-কেনা করার মত পণ্যসামগ্রী আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে তাকে কিছু বলা হবে না। যেহেতু ব্যবসায়ী হিসাবে নিরাপত্তা ব্যতিত তাদের আমাদের দেশে প্রবেশ করার সাধারণ নীতি প্রচলিত আছে।”[৪৪]

পক্ষান্তরে বর্তমানের অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। এখন যদি কেউ আমেরিকা বা ব্রিটেনের দূতাবাসে অথবা লন্ডন বা নিউয়র্কের বিমানবন্দরে এসে বলে, আমি মোল্লা ওমরের বা আবু ওমর আল-বাগদাদির বা ককেশাশের ইসলামী ইমারাতের আমির দুকু উমরুভের দূত, তাহলে তারা তাকে গ্রেফতার করে জেলে ভরবে এবং নির্যাতন করবে। সমগ্র বিশ্ব দেখেছে, পাকিস্তান ও আমেরিকা পাকিস্তানে নিয়োজিত ইসলামী ইমারাতের দূত মোল্লা আব্দুস সালাম যয়ীফের সাথে কি ব্যবহার করেছে!! অথচ তিনি পাকিস্তানে একজন রাষ্ট্রীয় দূত ছিলেন। কূটনৈতিক বিধি-নিষেধের সুবিধা ভোগ করছিলেন। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর আমেরিকার হাতে সোপর্দ করা হয়। সেখানে তাকে নির্যাতন করা হয়। বাগরাম ও গুয়ান্তানামো কারাগারে রাখা

---

৪৩ আস সিয়ারুল কাবির- ২/৫০৮

৪৪ আলমুগনি- কিতাবুল জিহাদ- মাসআলা-৭৪৯১, ২১/১৮

হয়। এমনিভাবে কেউ যদি তাদেরকে বলে, আমি একজন ব্যবসায়ী, তোমাদের থেকে ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের জন্য বা দাওলাতুল ইরাক আলইসলামিয়ার জন্য বা ককেসাসের ইসলামী ইমারতের জন্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে এসেছি, তাহলে তারা কি করবে?!!

অত:পর একই পরিচ্ছেদে শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে কতগুলো জায়েয কৌশলের পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলেন, যেগুলোর ব্যাপারে নীতি প্রচলিত আছে।

শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“তারা যদি রোমীয়দের সাদৃশ্য অবলম্বন করত এবং তাদের পোষাক পরিধান করত, অত:পর তাদেরকে কাফেররা বলত: তোমরা কারা? তারা বলত: আমরা রোমের একদল লোক। নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করেছিলাম। অত:পর তারা আহলে হরবের এমন কোন লোকের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করত, যাকে তারা চিনে, অথবা কারো সাথে সম্বন্ধিত নাই করত, আর এর ফলে তারা তাদেরকে ছেড়ে দিত, তখন তাদের জন্য হারবীদের কারো উপর সামর্থ্যবান হলে তাদেরকে হত্যা করলে বা তাদের সম্পদ ছিনতাই করলে সমস্যা হত না।

যেহেতু তারা যেটা প্রকাশ করেছে, এটা যদি প্রকৃতও হত, তথাপি এর দ্বারা তাদের মাঝে ও হারবীদের মাঝে নিরাপত্তা সাব্যস্ত হত না।

কারণ তারা একে অপর থেকে নিরাপদ নয়। তাই তাদের একদল যদি অপর দলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বা তাদের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, তাহলে সে সেটার মালিক হয়ে যাবে এবং সে যদি এগুলো নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য হালাল হবে।”[৪৫]

---

৪৫ আসসিয়ারুল কাবির- ২/৫০৮

তিনি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন:

“এমনিভাবে যদি তাদেরকে জানায় যে, তারা হল যিম্মী। তারা মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের নিকট এসেছে। ফলে তারা তাদেরকে তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়, তাহলে এটা আর পূর্বের মাসআলা একই।”[৪৬]

এখানেও প্রচলন ও চলিত রীতি বিবেচনা করা হয়েছে।

এ থেকেই শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ এর কথা দিয়ে ওয়াসিকার লেখকের দলিল পেশ করার ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যা ভিসাকে কাফেরদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদকারী গণ্য করার জন্য তিনি যেটা করেছেন।

(খ) ওয়াসিকার লেখক পাশ্চাত্য ও আমেরিকানদের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বাস্তবতার প্রতি একেবারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যেন আমেরিকান পাবলিক প্রচারণার উপর ভিত্তি করে বাস্তবতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। অথচ তারা তো পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিমরা যেইরূপ সুখে জীবন যাপন করে, সেইরূপ সুখী জীবনের গান গায়।

ওয়াসিকার লেখক এ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছেন যে, আমেরিকা যাকে চায় তাকেই কারাগারে নিক্ষেপ করে। তিনি উদাসীন হয়ে গেছেন যে, আমেরিকা বন্দীদের ব্যাপারে জেনেভা চুক্তির বিধি-নিষেধ সমূহ থেকেও লাগামমুক্ত হয়ে গেছে। তিনি উদাসীন হয়ে গেছেন গুয়ান্তানামোর ব্যাপারে। উদাসীন হয়ে গেছেন আমেরিকান গোপন কারাগারসমূহ ব্যাপারে।

শুধু তাই নয়, লেখক তার নিজের বাস্তবতাই ভুলে গেছেন। তিনি ইয়ামানে তার প্রকৃত নাম দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বসবাস করতেন। ইয়ামানী গোয়েন্দারা তার পাসপোর্ট খুজতো, তার সম্পর্কে জানার জন্য। তারা তাকে

---

৪৬ প্রাগুক্ত, [২/৫০৯]

নিয়মতান্ত্রিকভাবে বসবাস করার অনুমতি দেয়। কিন্তু যখন আমেরিকা তাকে বন্দী করার আদেশ করল, তখন ইয়ামান বা তার মনিব আমেরিকা তার আকামার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না বা সেই নিরাপত্তা সনদকেও গণ্য করল না, যেটা নিয়ে লেখক এতো হাকডাক করছেন মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে সরানোর জন্য।

বস্তুত ইয়ামানী কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে তাকে বন্দী করে নি। বরং যেহেতু তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার মিত্র তাই করেছে। তাই ইয়ামান বা আমেরিকা কেউই তার সরকারী আকামাকে নিরাপত্তা বা কোন কিছু হিসাবেই গণ্য করল না। লেখক এটা চাক্ষুসভাবেই জানেন।

(গ) তারপর প্রশ্ন হল, **লেখকের কথা থেকে কি এটা বুঝা যায় না যে, তিনি ফিলিস্তীনের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে মুজাহিদগণের পক্ষ থেকে পরিচালিত ইস্তেশহাদী অভিযানগুলোকে গাদ্দারী এবং নাজায়েযে মনে করেন, যেখানে মুজাহিদগণ ইসরাঈলের পরিস্কার অনুমতির মাধ্যমে ইসরাঈলের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন বা যারা এগুলো পরিচালিত করেছেন বা যারা এতে সাহায্য করেছেন এই অনুমতি ও আকামার কারণে তারা গাদ্দার?**

(ঘ) **সাধারণ মূলনীতি হল, কাফেরের রক্ত নিরাপত্তা, যিম্মাচুক্তি বা সন্ধি ব্যতিত সংরক্ষিত হয় না।** তাই যে ভিসাকে নিরাপত্তাচুক্তি দাবি করবে, তাকে সুস্পষ্ট দলিল দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় বিষয়টি তার স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকবে। আর যে মূলকে আকড়ে থাকে, তার উপর আপত্তি চলে না। আর লেখক যে সমস্ত বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন- গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক... এমন আরো যত শব্দ মুজাহিদগণের ব্যাপারে ব্যবহার করেছেন, তা সঠিক নয়।

লেখকের কথার মধ্যে এরকম আরেকটি উদাহরণ হল, তিনি উল্লেখ করেছেন:"অক্ষমতার কারণে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব নয়।" যে অক্ষমতার দাবি করে, তার উপর আবশ্যক সুস্পষ্ট

দলিলে দিয়ে তা প্রমাণ করা। অন্যথায় বিষয়টি আপন মূলনীতির উপরই বহাল থাকবে। আর লেখকের উচিত এ ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে গালি গালাজের পদ্ধতি থেকে উর্ধ্বে উঠে আসা।

(ক) আমরা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে, আমেরিকা ও অন্যান্য ঐ সকল ক্রুসেডার রাষ্ট্র, যারা আজ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় যাবত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনে আমেরিকার সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে, তাদের ভিসা একটি নিরাপত্তা চুক্তি, তথাপি এই নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে দুই কারণে:

প্রথমত: আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, মুসলিমদেরকে নির্যাতনকারী এবং তাদের নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালিদানকারীদের রক্ত নিরাপত্তা চুক্তির দ্বারা হেফাজত হয় না।

দ্বিতীয়ত: আমেরিকা ও তার মিত্ররা প্রতিদিনই তাদের চুক্তি ভঙ্গ করছে।

(খ) **আমেরিকান জনগণ যুদ্ধ-শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই একটি সত্তা।** তাই যেমনিভাবে তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি করতে হয় না, এমনিভাব যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা চুক্তি করা আবশ্যক নয়। যখন তাদের নেতার কাজে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। তাহলে যদি ট্যাক্স দিয়ে এবং নির্বাচন, মিডিয়া, সেনাবাহিনী গঠন ও প্রতিরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহে তাদেরকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে, তাহলে কি অবস্থা হবে?!

(গ) **দায়ভারের মধ্যে মিত্ররাও শরীক থাকে, যদি তারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের প্রতিবাদ না করে। তাহলে যদি সরাসরি সীমালঙ্ঘনে অংশগ্রহণ করে তাহলে কি হবে?! এর উদাহরণ হল, আমেরিকা ও ইসরাঈলের সাহায্যের জন্য গঠিত ন্যাটো জোট।**

(ঘ) যখন তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বাস্তবে সংঘটিত হয়েই যায়, তখন মুসলমানদের উপর তাদেরকে যুদ্ধ শুরুর কথা ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক নয়। আর যদি তারা সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে বারবার ঘোষণাই দেয়, তাহলে কি হতে পারে?!

(ঙ) **<u>মুজাহিদগণের জন্য সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন করা জায়েয আছে।</u>** যার মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের বদনাম করা এবং মুসলিমদের দেশসমূহে সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের উপর আঘাত হানার সুবিধার জন্য নিজেদেরকে অমুসলিম বলে প্রকাশ করাও অন্তর্ভূক্ত।

শেষ কথা

আজ আমাদের সামনে দু'টি সুযোগ আছে:

হয়ত আমরা আমেরিকান, ইহুদী, ফ্রান্স, রুশ ও হিন্দুদেরকে আমাদের থেকে প্রতিহত করব এবং আমাদের ভূমিগুলোকে ধর্মত্যাগী ও ইসলামের সম্মান নষ্টকারী তাদের নিকৃষ্ট দালালগুলো থেকে পবিত্র করব। যেন আমরা মুসলিম হিসাবে, সম্মানের সাথে এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের প্রভূর ইবাদত করতে পারি, যেভাবে তিনি আদেশ করেছেন। ইসলামের বার্তার এবং ইনসাফ ও শুরা ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে পারি। আর এটাই হল পূত-পবিত্র নববী সুন্নাহ, যা আমাদের সামনে সঠিক পথের নকশা একে দেয় এবং ত্যাগ, কুরবানী, বীরত্ব ও বাহাদুরীর অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করে।

অথবা আমরা বশ্যতা, আনুগত্য পলায়নপরতা, যেকোন মূল্যে জেল থেকে বের হওয়ার পথ খোজা, জীবিকা উপার্জন ও স্ত্রী-পরিবার প্রতিপালনে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া আর ক্রুসেডার ও ইহুদীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার পথ গ্রহণ করব। অপরদিকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নৈরাজ্য বিস্তার করতে থাকবে এবং আমাদের উপর চাপিয়ে দিবে আগ্রাসন, হত্যা, ভয়-ভীতি, লাঞ্ছনা, দূর্ণিতিবাজদের মাঝে শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকার এবং অবশেষে আল্লাহ যে পর্যন্ত চান...। এ হল জিহাদকে বসিয়ে দেওয়ার ওয়াসিকা। যা আমাদেরকে এসবের দিকেই নিয়ে যেতে চায়।

(খ) পরিশেষে আমি আবার বলছি যে, **এটি একটি নবসৃষ্ট মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ।** যার প্রতি আমি ও আমার মুজাহিদ ভাইগণ পরিতৃপ্ত হয়েছেন। আমরা এর উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, বাস্তব অবস্থা, সামাজিক প্রচলন (عرف), চিরাচরিত অভ্যাস (عادة) এবং সত্য প্রকাশকারী ও স্বাধীনচেতা উলামার বক্তব্যের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছি। **তাই যিনি এই ইজতিহাদের প্রতি পরিতৃপ্ত হবেন, তিনি মাসলাহাত**

নির্ধারণ করত: এর উপর আমল করবেন। আর যিনি পরিতৃপ্ত না হবেন, তিনি অন্য কোন পথ খুজে নিতে পারেন, যার মাধ্যমে মুসলিম দেশে জবরদখলকারী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে। আর তৃতীয় যে বিষয়টির ব্যাপারে আমি প্রতিটি মুসলিমকে সতর্ক করব, তা হল, আমাদের ব্যাপারে যেন আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য না হয়-

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের উঠাই আল্লাহর পসন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা (পঙ্গুত্যের কারণে)বসে আছে তাদের সঙ্গে তোমরাও বসে থাক।" (বারাআহ:৪৬)

কবি মুতালাম্মাস আদ-দাব্বী বলেন:

- *যে লাঞ্ছনায় তাঁকে বিদ্ধ করা হয় তাকে, দাঁড়াতে পারবে সেই আঘাত সত্য করে কেউ*

- *তবে গাধা আর পেরেকের ন্যায় দুই হীন ব্যতিক্রম*

- *একটিকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় লাঞ্ছনার স্থানে*

- *অপরটিকে সজোরে আঘাত করা হয়, কিন্তু কেউ কাঁদে না তার শোকে।*

আমির সানআনী রাহিমাহুল্লাহ তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

- *কিন্তু যখন বিচ্ছেদ হয় এমন সফরে, যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হয়, তাতে আমার বাহু দুর্বল হয় না।*

- *কারণ এটা তো ঐ সকল মন্দাচার থেকে হিজরত, যা আমার দেশের জালিম শাসকরা সৃষ্টি করেছে।*

- *আমার মত লোক অবস্থান করবে এমন দেশে, যেখানে কায়েম করা হবে না এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ ও তার রাসূলের শরীয়ত।*

- *আমি যদি কোন দেশে লাঞ্ছনা মেনে নিতে রাজি হয়ে যাই, তবে যেন আমার চাবুক আমার হাত পর্যন্ত না উঠে।*

- *যে লাঞ্ছনা আরোপ করার ইচ্ছা করা হয়েছে, কেউ দাঁড়াতে পারবে না তাতে। তবে গাধা ও পেরেকের ন্যায় দুই হীনই কেবল পারে।*

কবি মুহাম্মদ ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন: (কবিতার তরজমা)

- শব্দ আর অর্থের মধ্যে পার্থক্য নেই, কিন্তু উভয়টির মর্যাদা ভিন্ন।
  মোল্লার আযান আর মুজাহিদের আযানের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য।